প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

ঈদুল ফিতর সংখ্যা

The Fortnightly Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ২৩ ও ২৪তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ আষাঢ়, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ৫ শাওয়াল, ১৪৩৮ হিজরি | ৩০ ইহসান, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩০ জুন, ২০১৭ ঈসাব্দ

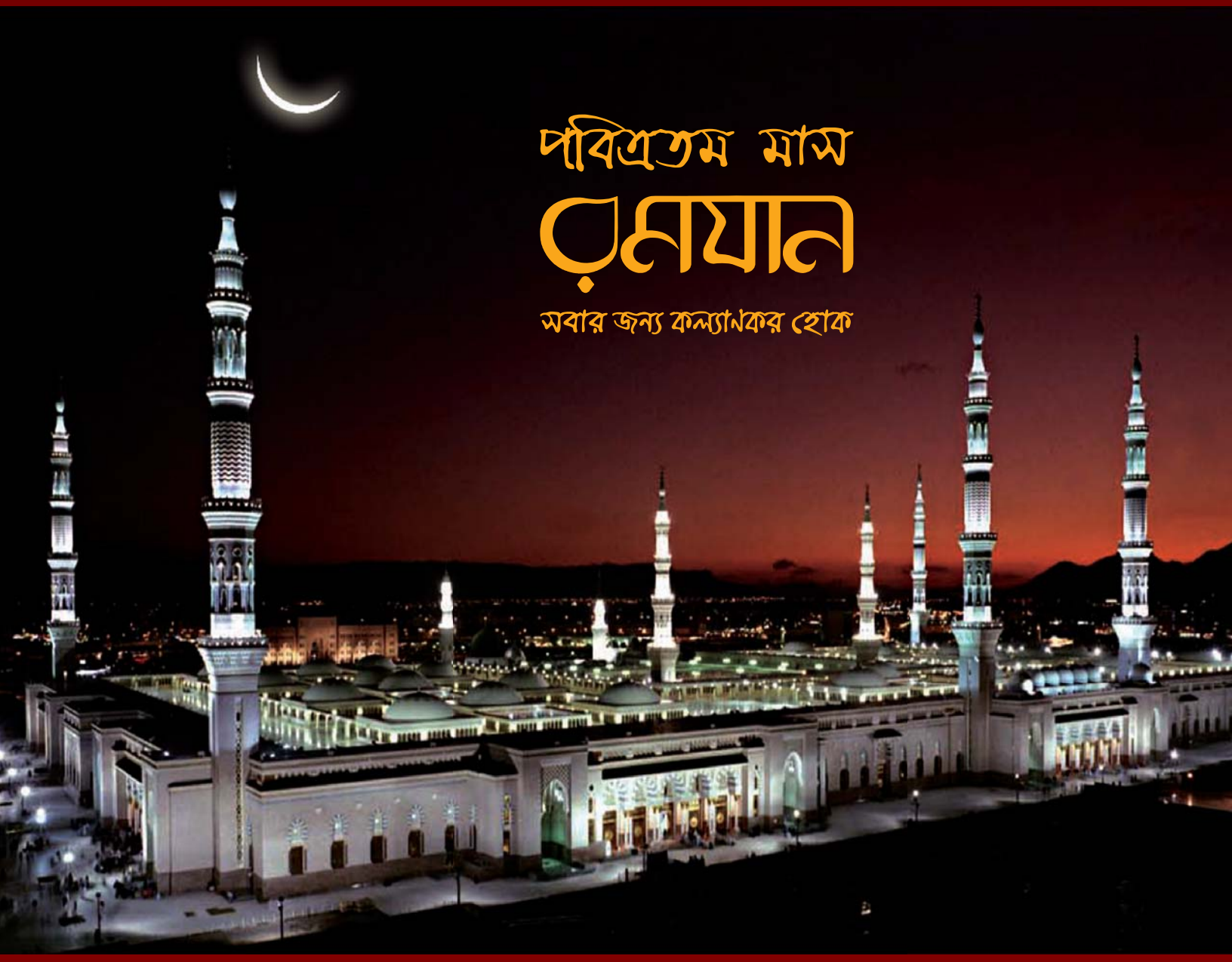

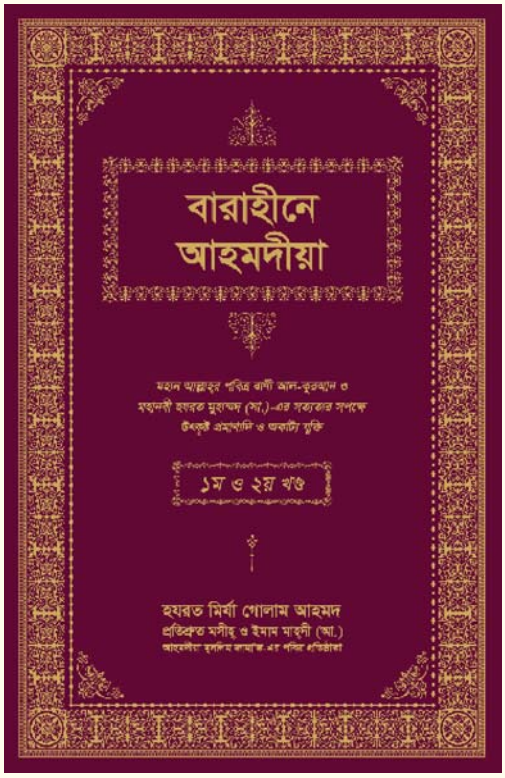

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

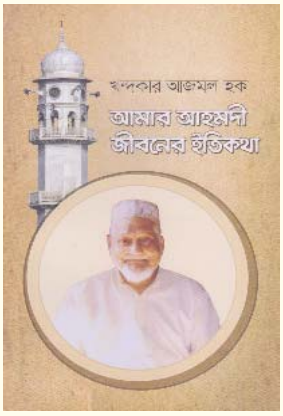

খন্দকার আজমল হক সাহেব জামা'তের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। বহুকাল যাবত বিভিন্ন সেবা দ্বারা জামা'তের খেদমত করে চলেছেন। লিখেছেন **'কুরআন ও জীবন'** নামক একটি অনন্য পুস্তক। বলা যায়, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আহমদীর ঘরে এই বইটি রয়েছে যার মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ জামা'তের এই নিষ্ঠাবান সেবকের জীবনীমূলক বই **'আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা'** প্রকাশিত হয়েছে। জামা'তের নতুন সেবকদের জন্য এটি একটি প্রেরণামূলক পুস্তক।

পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। যার মূল্য ৫০/- টাকা মাত্র। জামা'তের সকলকে বইটি অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

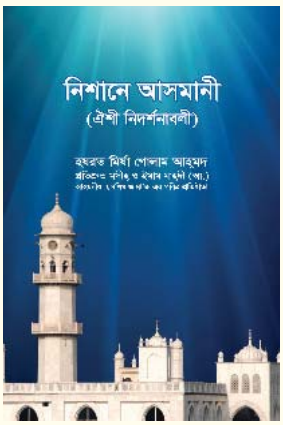

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

সিয়াম সাধনায় লাইলাতুল ক্বদর লাভ করে সার্থক হোক মানবজীবন

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় আমরা পবিত্র রমযানের রহমত ও মাগফিরাতের দিনগুলো অতিবাহিত করে নাযাতের দশকে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্‌। রমযানের এই শেষ দশকে আল্লাহ্‌ তা'লা মহাসৌভাগ্যের এক রাত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যার নাম লাইলাতুল ক্বদর। এই সৌভাগ্য রজনী পাওয়া মু'মিনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। সারা জীবন কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে প্রবৃত্তিরূপ শয়তানকে পরাভূত করার পর মু'মিনের নিকট সেই পরম মুহূর্তটি আসে যাকে আল কুরআনে বলা হয়েছে 'লাইলাতুল ক্বদর", হাজার মাসের চেয়েও যা উত্তম।

সুতরাং এ রাতটা আমাদের জন্য সারা জীবনের সাধনার চাইতেও ক্বদরের তথা কল্যাণের ও মর্যাদার। মু'মিন এ রাতে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করে, যার ইঙ্গিত আমরা সূরা বাকারার ১৮৬ আয়াতে পেয়ে থাকি। সুতরাং সেই মুহূর্তটি প্রত্যেক মু'মিনের জীবনে অতি কাঙ্ক্ষিত ক্ষণ।

হাদীস পাঠে জানা যায় হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত- হযরত রাসূল করীম (সা.) ক্বদরের রাত্রি সম্বন্ধে বলেছেন 'রমযান মাসের শেষের দশ রাত্রিসমূহে লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান কর' (বুখারী)।

তিনি (সা.) আরো বলেছেন 'তোমাদের কাছে রমযান এসেছে। রমযান মোবারক মাস। আল্লাহ্‌ তা'লা রমযানে তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করেছেন। এ মাসে বেহেশ্‌তের দ্বারা সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে আর দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দৃষ্কৃতকারী শয়তানকে শৃঙ্খল পরানো হয়েছে।

এ মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বর্ণিত (বুখারী)। সেই শুভ মুহূর্তটি পাওয়ার জন্য আমরা যেন আজীবন চেষ্টা করি, কেননা নিষ্ঠাবান সাধনাকারীকে আল্লাহ্‌, কখনও নিরাশ করেন না।

রমযানের শেষ দশকে দোয়া কবুলিয়তের বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়। এই শেষ দশকে ইতেকাফকারীরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর ভালবাসায় আত্মমগ্ন হয়ে ইতেকাফে বসেন আর এই দশদিন গভীরভাবে হেদায়াতে রত থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে, যখন রমযান শেষ দশকে প্রবেশ করতো বা শেষ দশক শুরু হতো, তখন হযরত রসূল করীম (সা.) কোমর বেঁধে তাতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাঁর রাতগুলোকে জীবিত করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকেও ইবাদতের জন্য জাগাতেন। পরিবার-পরিজনকে জাগানো তো হযরত রসূল করীম (সা.) এর সব সময়ের সাধারণ রীতি ছিল একং তাঁর রাত্রিগুলোও (ইবাদতে) জীবিত-ই থাকতো, তবে রমযানে তা এক বিশেষ মাত্রায় উন্নীত হতো।

অতএব, রমযানের এই শেষ দশকে, সিয়াম সাধনায় অধিকতর চেষ্টা-প্রয়াস এবং অধিকতর মনোনিবেশ করা আবশ্যক। আগে থেকে যারা তাহাজ্জুদগুযার রয়েছেন তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই দশ রাতের তাহাজ্জুদের মধ্যে নতুন কোন মাত্রা যোগ হওয়া চাই, যা আমাদের পূর্বে আদায়কৃত তাহাজ্জুদে ছিল না।

আমরা অবশ্যই নাজাতের এই দশকে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগীতে রত থেকে, দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য যাচনা করব।

মহান আল্লাহ্‌ আমাদেরকে লাইলাতুল কদরের বরকতে খোদা মিলনের স্বাদে ঈদের প্রকৃত আনন্দ লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

সকলকে পবিত্র ঈদুলফিতরের নিরন্তর শুভেচ্ছা–

'ঈদ মুবারক'

সূচিপত্রে

১৫ ও ৩০ জুন, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১০
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **১৯ জুন, ২০১৫ জুমুআর খুতবা** ১৩

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক ৮ জানুয়ারী, **১৯৯৯ মসজিদ-ফযল-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা** ১৯

জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **৭ জুলাই, ২০১৬ ঈদুল ফিতরের খুতবা** ২৮

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ৩৪
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

পবিত্র রমযান মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলনের মাধ্যমে খোদা-মিলনের স্বাদে পরিতৃপ্ত করে ৩৮
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

কলমের জিহাদ ৪৪
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

রমযানের মাসলা-মাসায়েল ৪৬
মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ৪৯
মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)

সফরে এবং অসুস্থতায় রোযা পালন সম্পর্কিত নির্দেশনা ৫২
রইস আহমদ

ব্যবহারিক জীবনে পালনীয় কতিপয় বিষয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুফতি সাহেবের ফয়সালা ৫৪

মহান স্রষ্টাকে লাভ করাই আসল ঈদ ৫৫
মৌ. এনামুল হক রনি

সংবাদ ৫৭

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি ৬৩

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন ৬৪

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۶﴾

১১৬। গ.তিনি তোমাদের জন্য কেবল মৃতজীব, রক্ত ও শূকরের মাংস এবং সেসব (খাবার) হারাম করেছেন যেগুলোর বেলায় আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে একান্ত অপারগতায় বাধ্য হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ
الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ
لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ؕ

১১৭। আর ক.তোমরা নিজ মুখে যে মিথ্যাচার করে থাক এর উপর ভিত্তি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী হয়ে (একথা)বলো না, 'এটা হালাল, ওটা হারাম'। আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারীরা কখনো সফল হয় না।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۠ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱۸﴾

১১৮। খ.সামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পর তাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا
عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ
كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۹﴾

১১৯। আর যারা ইহুদী হয়েছে তাদের জন্যও আমরা সেসব বস্তু হারাম করেছিলাম যার উল্লেখ আমরা তোমার কাছে পূর্বে করে এসেছি। গ.আমরা তাদের উপর কোন যুলুম করি নি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতো।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ
اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۰﴾ ع

১২০। ঘ.তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত[১৫৮৫] মন্দ কাজ করে ফেলে (এবং) এরপর তওবা করে ও (নিজেকে) শুধরে নেয় (হ্যাঁ) তোমার প্রভু-প্রতিপালক এরপরও নিশ্চয় অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

১৫৮৫। 'জাহালাহ' অর্থ জ্ঞানের অভাব এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অভাব-উভয় প্রকার অজ্ঞতা প্রকাশক। এখানে শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার কোন মানেই হয় না যদি সেই ব্যক্তি সে আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান-ই না রাখে, যা পালন না করার অপরাধে সে শাস্তি পায়।

হাদীস শরীফ

মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ যিকরে ইলাহীতে নিহিত

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, আদম সন্তানকে যিকরে ইলাহী ব্যতিরেকে অন্য আর কোন আমল নেই, যা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

কুরআন :

'এরপর তোমরা যখন নামায শেষ কর, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর...' (সূরা আন-নিসা:১০৪)।

'যারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থাতেও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে..' (সূরা আলে ইমরান: ১৯২)।

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে যাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। মনে রেখো! আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে' (সূরা আর্ রা'দ: ২৯)।

হাদীস :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'লা আকাশের নিম্নস্তরে চলে আসেন এবং বলেন, আমি মালিক, আমাকে কে ডাকছে, যার ডাকের উত্তর আমি দিব, আমার থেকে কে চাচ্ছে, যাকে আমি দিব, আমার থেকে কে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, যাকে আমি ক্ষমা করব, এরকম অবস্থা সকাল পর্যন্ত থাকে। (তিরমিযি)

অপর এক হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, রোযার রাত্রে ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তোমার উম্মতকে আমার তরফ হতে সালাম পৌঁছে দিও এবং তাদেরকে বলো, জান্নাতের মাটি খুব উর্বর এবং পানি খুব মিষ্ট, কিন্তু সেখানে কোন বৃক্ষ নেই। তোমরা যদি জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করতে চাও, তাহলে **'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার'** বার বার পাঠ কর।

আরেক স্থানে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, আদম সন্তানদের জন্য যিকরে ইলাহী ব্যতিরেকে অন্য আর কোন আমল নেই, যা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

ব্যাখ্যা :

কুরআন ও হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, মানব জাতির সার্বিক-কল্যাণ যিকরে ইলাহীতে নিহিত। 'যিকরে ইলাহী'-দ্বারা আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতের অধিকারী হওয়া যায়। তাই আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, একমাত্র যিকরে ইলাহীই মানব সন্তানকে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচাতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি সর্বদা যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকে, তার হৃদয় খোদার ভয়ে ভীত থাকবে এবং ঐ সমস্ত কর্ম হতে বিরত থাকবে, যার দরুন খোদা অসন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ্‌র যিক্‌র হৃদয়কে নরম ও কোমল করে এবং রূহানী উন্নতি লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বেশী বেশী 'যিকরে ইলাহী' করার তৌফিক দান করুন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্‌ওয়া

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

জগদ্বাসী তাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁকে প্রাধান্য দাও, যাতে আকাশে তোমরা তাঁর জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হতে পার। রহমতের নিদর্শন দেখানো আদিকাল থেকেই খোদা তাআলার রীতি, কিন্তু তোমরা এই রীতির দ্বারা তখনই উপকৃত হতে পারবে, যখন তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকে এবং তোমাদের সন্তুষ্টি তাঁর সন্তুষ্টি ও তোমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক সফলতা ও বিফলতার সময় তোমাদের মস্তক তাঁর দ্বারে অবনত থাকে, যেন তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। যদি তোমরা এইরূপ কর, তাহলে সেই খোদা তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবেন, যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপন চেহারা লুক্কায়িত রেখেছেন। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে, যে এই উপদেশ মত কাজ করতে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে এবং তাঁর 'কাযা' ও 'কদরে' (ফয়সালা ও নিয়তিতে) অসন্তুষ্ট না হতে প্রস্তুত?

যে-ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে।

অতএব বিপদ দেখলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হবে, কারণ, এটাই তোমাদের উন্নতির উপায়। তাঁর তৌহীদ জগতে প্রচার করতে নিজেরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ও তাদেরকে নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সৃষ্ট-জীবের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কারো প্রতি, সে তোমার অধীনস্থ হলেও, অহঙ্কার দেখাবে না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্য-পরায়ণ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানভূতিশীল হও, যেন খোদা তাআলার নিকট গ্রহণীয় হতে পার। অনেকে এইরূপ আছে, যারা বাহ্যতঃ সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং কেউ তাঁর নিকট কখনো গ্রহণীয় হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করে তাকে সুদপদেশ দিবে। ধনী হলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ হতে সাবধান থাকবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপাসনা করবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁর জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাক্‌ওয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছো।

সুতরাং যে-ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। সুতরাং, হে লোক সকল! যারা নিজেকে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করে থাক, আকাশে তোমরা কেবল তখনই আমার জামা'তভুক্ত বলে পরিগণিত হবে, যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্‌ওয়ার (খোদাভীরুতার) পথে অগ্রসর হবে।

সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতিসহকারে এবং নিবিষ্ট-চিত্তে আদায় করবে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষাৎভাবে দেখতে পাচ্ছো। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যারা যাকাত দিবার উপযুক্ত, তারা যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে এবং তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চয় স্মরণ রেখো যে, কোন কর্মই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যাতে তাক্‌ওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য-কর্মের মূল তাক্‌ওয়া (কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণের ২২-২৩ ও ২৬-২৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)।

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৩য় খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

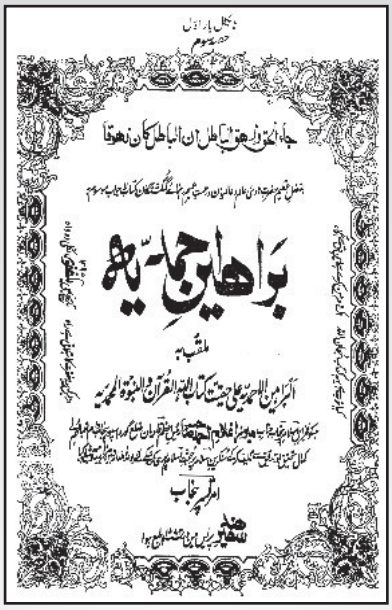

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৩০তম কিস্তি)

(টীকা নং-১১ চলমান)

অতএব এ পুরো বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, ইলহামে অবিশ্বাসীরা খাঁটি একত্ববাদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত আর তাদের আত্মা হতে প্রকৃত বিশ্বাসীদের ন্যায়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۫ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ

(সূরা আল্ আরাফ: ৪৪)। অর্থাৎ সকল প্রশংসা খোদা তা'লার যিনি স্বয়ং আমাদের জান্নাতের পানে পরিচালিত করেছেন, যদি খোদা পথ না দেখাতেন তাহলে আমরা কোন ছার যে, নিজ যোগ্যতাবলে গন্তব্যে পৌঁছে যাবো , ধ্বণি উত্থিত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়? তারা খোদার মূল্যায়ন অতি ঘৃণ্যভাবে করেছে। যেসব উত্তম গুণাগুণ আবশ্যিকভাবে খোদার প্রতি আরোপিত হওয়ার ছিল, তারা সাধুবাদ দিয়েছে নিজেদের বুদ্ধিকে আর তাঁর যে মহিমা প্রকাশ করা উচিত ছিল, সেই মাহাত্ম প্রদান করেছে নিজেদের প্রবৃত্তিকে। আর যে সকল পরাক্রমশালী শক্তি একান্তই তাঁর বিশেষত্ব, সে সবের মালিক সেজে বসেছে নিজেরাই। তাদের সম্পর্কে সম্মানিত খোদা পরম সত্যই বলেছেন যে আরবী হবে.... আনআম ৯২) অর্থাৎ ইলহামের অস্বীকারকারীরা খোদার কল্যাণময় সত্ত্বার মূল্য বোঝে নি। আর তাঁর করুণারাজিকে চিনেও নি, যা বান্দাদের সকল প্রয়োজনে উথলে উঠে; এ কারণেই তারা বলেছে, খোদা কোন মানুষের প্রতি কোন গ্রন্থ নাযিল করেন নি।

(ফার্সি পংক্তির অনুবাদ)

তোমার বুদ্ধি সদা তোমাকে অহংকারে লিপ্ত রাখে, যাও! এমন বিবেক সন্ধান কর যে তোমাকে অহংকার থেকে মুক্তি দেবে।

খোদার জ্ঞান খোদা হতে শিখবো আমাদের জন্য এটিই অনেক উত্তম, কেননা আমাদের কাছে যে-জ্ঞান আছে তাতে রয়েছে শতশত ভ্রান্তি ,

যদি খোদা নীরব থাকেন, তাহলে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কে বলতে পারে? আর তিনি যদিতোমাকে ছেড়ে দেন, হে নির্বোধ! তাহলে কে তোমাকে সাহায্য করতে পারে?

আর বৃথা তর্কবাজি ছেড়ে দিয়ে যা তাঁর মূল্য, বোঝার চেষ্টা কর কেননা যেকথা তুমি বর্ণনা করছ তা তোমার জন্য সমস্যা ডেকে আনবে,

আমি দৃপ্তকণ্ঠে নিশ্চিতরূপে বলছি, ইলহামকে বাদ দিয়ে নিছক বুদ্ধির দাসত্ব কেবল ক্ষতিকরই নয় বরং এটি সেই বিপদ বা বিপত্তি, যা হতে বহু বিপদাপদ ও সমস্যা জন্ম নেয় যার বিশদ বিবরণ (ইনশাআল্লাহ্) যথাস্থানে প্রদান করা হবে। মহাসম্মানিত খোদা যেভাবে প্রত্যেক বস্তুর পারস্পরিক জুটিবন্ধন সৃষ্টি করেছেন অনুরূপভাবে ইলহাম ও বুদ্ধিরও পারস্পরিক জুটিবন্ধন সৃষ্টি করেছেন।সেই নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞার প্রকৃতিতে বিরাজমান সার্বজনীন রীতি হলো, যতদিন একটি বস্তু স্বীয় জুটি হতে বিচ্ছিন্ন থাকে ততদিন এর বৈশিষ্ট্যাবলী সুপ্তই থেকে যায় বরং অধিকাংশ সময় লাভের পরিবর্তে

ক্ষতিই হয়। বুদ্ধি বা চেতনার অবস্থাও অনুরূপ; ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর শুভ ও কল্যাণকর লক্ষণাবলী তখন প্রকাশ পায় যখন তা জুটি অর্থাৎ ইলহাম এর সাথে যুক্ত হয়। নতুবা জুটি ছাড়া তা পিশাচ বা প্রেত বিশেষের ন্যায় আচরণ করে আর পুরো গৃহ গ্রাস করতে উদ্যত হয়। গোটা শহরকে ধ্বংস ও বিরাণ করে দিতে চায়। কিন্তু জুটিবন্ধন গড়ে উঠলে, তার চেহারা ও বৈশিষ্ট্য কতই না সুন্দর হয়ে যায়–অশুভ দৃষ্টি হতে খোদা একে রক্ষা করুন। যে গৃহে তা অবস্থান করে সে গৃহকে প্রাচুর্যে ভরে দেয়, যার কাছে যায় তার সকল দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটায়। তোমরা নিজেরাই একটু চিন্তা করে দেখ!, জুটি ছাড়া কোন জিনিস একা কি-ইবা কাজ করতে পারে?

তাই প্রশ্ন হলো, তোমরা কেন এই ভোতা বুদ্ধিকে এত অহংকারের সাথে উপস্থাপন কর? এটি কি তা নয় যা বারবার প্রতারণার কারণে লাঞ্ছিত হয়েছে? এটি কি তা নয়, বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ার কারণে যার মাথায় বড় বড় ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান? আমাকে একটু বলুন দেখি যে এতে ভাল লাগার কি আছে যার প্রতি আপনারা আকৃষ্ট হচ্ছেন? এটি কোথাকার পরি-অপ্সরি উড়ে এসে জুড়ে বসলো, যাকে আপনারা মনপ্রাণ সঁপে দিলেন? আপনারা কি জানেন না, এটি আপনাদের পূর্বে কতজনের রক্ত চুষেছে? কত জনকে ভ্রষ্টতার কুঁপে ফেলে ধ্বংস করেছে? আপনাদের মত অনেক প্রেমিককে সে ভক্ষণ করেছে, সে শত-শত লাশ ফেলেছে। আমাকে একটু বল! একা এই বুদ্ধির জোরে তোমরা এমন কোন্ ধর্মীয় সত্য আবিস্কার করেছ যা পূর্বেই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই? বেশি নয় কেবল দু'চারটি এমন দৃষ্টান্ত দেখাও। নিছক যুক্তি ও বুদ্ধির জোরে যদি তোমরা এমন সুমহান সত্য ও তত্ত্ব উদঘাটন করতে যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই তবুও মানা যেতো। এমন পরিস্থিতিতে তোমরা অতি গর্বের সাথে নিজেদের বৈঠকে বসে বলতে পারতে যে, আমরা এমন মানুষ, যারা সেসব সত্য উদঘাটন করেছে যা ঐশী গ্রন্থাবলীতে নেই। কিন্তু আক্ষেপ! তোমাদের বিভিন্ন পুস্তিকায় গুটি-কতক সেসব কথা ছাড়া আর কিছুই নেই, যা পবিত্র কুরআন হতে চুরি করা। এছাড়া যা কিছু চোখে পড়ে তা অকেজো বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়, যা হতে বুদ্ধির পরিবর্তে তোমাদের জ্ঞানহীনতা, নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রান্তিই প্রকাশ পায়, যার স্বরূপ এ গ্রন্থে খোলাশা করে লেখা হবে; ইনশাআল্লাহ্।

অতএব এই মুখ এবং এই যোগ্যতা নিয়ে ঐশী ইলহামকে অস্বীকার করা নিজেই খোদার স্থলাভিষিক্ত সাজা আর পবিত্র নবীদেরকে স্বার্থপর মনে করা-এ হলো আপনাদের পূত-পবিত্র প্রকৃতির স্বরূপ! আত্মপ্রতারণায় মগ্ন হয়ো না যে, বুদ্ধি ভাল বা উন্নত কোন বিষয় আর আমরা সকল প্রকার গবেষণা যুক্তি-বুদ্ধির ভিত্তিতেই করি! বুদ্ধি বা বিবেচনার কল্যাণকর হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর গুণাগুণ তখনই প্রকাশ পায় যখন এটি আপন জুটির সাথে সম্পৃক্ত থাকে নতুবা প্রতারিত করার ক্ষেত্রে সে শত্রুদের চেয়েও ভয়াবহ আর দ্বৈত-আচরণ প্রদর্শনে মুনাফিকদের চেয়েও এগিয়ে। অথচ তোমাদের দুর্ভাগ্য, তোমরা এর বেলায় 'জুটি'র নামটি শোনাও পছন্দ কর না! বন্ধুগণ, ভালভাবে চিন্তা করে দেখ, জুটি ব্যতীত কোন কিছুরই গত্যন্তর নেই। খোদা জোড়া জোড়া সৃষ্টি বা 'জুটি'কে এক বিস্ময়কর বিষয় হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যেদিকেই তাকাবে, জুটির মাধ্যমেই কাজ হতে দেখবে। আমরা-তোমরা, সবাই চোখ দিয়েই দেখি, কিন্তু সূর্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। কানের মাধ্যমে শুনলেও বাতাসের প্রয়োজন রয়েছে। সূর্য আত্মগোপন করলেই অন্ধ হয়ে যেতে হয়। কানে বাতাস প্রবেশের পথ বন্ধ করে দাও তাহলে শ্রবণশক্তি কাজে আসবে না। যে মহিলার স্বামীর সাথে মেলামেশাই হয় না, সে কীভাবে অন্ত:সত্ত্বা হতে পারে? যে কৃষিজমিতে পানিই স্পর্শ করেনি, তাতে কীভাবে ফলন হতে পারে?

এ কথাগুলো এমন নয়, যা তোমাদের জ্ঞানের অতীত। এটি সেই প্রাকৃতিক নিয়ম, তোমরা যার অনুসরণের দাবী করছ। অতএব, এখন এই দাবীকে কার্যে রূপায়িত করে দেখাও, যেন লোক দেখানোর মাঝেই তোমাদের সমূহ কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ না থাকে।

(ফার্সি কবিতার অনুবাদ)

১. প্রত্যেক চোখের জন্য হয় আলোর প্রয়োজন, খোদার রীতি এটিই।

২. দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখের জন্যও উজ্জল সূর্য ছাড়া কীভাবে দেখা সম্ভব হতে পারে? এমন চোখ খোদা কখন বানিয়েছেন?

৩. যেখানে তুমি স্বয়ং প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন কর সেখানে অন্যদের ওপর কেন আপত্তি কর? মাথা ঝাঁকাও

৪. যিনি সকল বিষয়ে (সৃষ্টির) চাহিদা পুরণ করেন তুমি কিভাবে ভাবলে যে তিনি পথের দিশা দেবেন না?

৫. যিনি তোমার পৃষ্ঠদেশকে কঠিন বোঝা থেকে মুক্তি দিতে ঘোড়া, গাধা ও গাভী সৃষ্টি করেছেন

৬. তিনি তোমাকে পরকালের বিষয়ে কেন অনিশ্চয়তার মাঝে ছেড়ে দেবেন? আশ্চর্যের বিষয় যে তুমি বুদ্ধিমান হওয়ার দাবী কর এই বিশ্বাস পোষণ কর!

৭. হে অজ্ঞ! যেখানে তোকে দুটো চোখ দেয়া হয়েছে, সেখানে দেখবার কালে একটি বন্ধ করে রাখিস কেন?

৮. সেই সত্ত্বা যার পক্ষ থেকে সকল প্রকার শক্তি স্পষ্টতই প্রকাশমান, প্রশ্ন হলো তাঁর বাকশক্তি কীকরে অপ্রকাশিত থাকতে পারে?

৯. সেই সত্তা, যার সকল পবিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত-বিকশিত, সেখানে এই বৈশিষ্ট্য কী করে গোপন থাকা সম্ভব ছিল?

১০. প্রত্যেক ব্যক্তি, বন্ধুর স্মরণে যে উদাসীন, ঔদাসীন্যের একমাত্র চিকিৎসা হলো তার বন্ধুর বাণী?

১১. খোদার বাণী সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করিস তুই! হে অহংকারী! এ তোর কেমন বিবেক-বুদ্ধি ?

১২.তাঁর দয়া মাটির মানুষের মাঝে ভালবাসা সঞ্চার করলো যখন, সেখানে তিনি নিজের প্রেমিকদের কী করে ভুলতে পারেন?

১৩. যেখানে পরম দয়াপরবশ হয়ে তিনি স্বয়ং ভালবাসা দিয়েছেন, সেখানে তোমাকে এই বেদনার ঔষধ কেন দেবেন না?

১৪. যেখানে তিনি স্বয়ং স্বীয় প্রেমানলে হিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, সেখানে কেন তিনি দয়া-পরবশ হয়ে তোমার সাথে বাক্যালাপ করবেন না?

১৫. বন্ধুর সাথে বাক্যালাপ ছাড়া হৃদয় স্বস্তি পায় না, তা বন্ধু চোখের সামনেই (বসে) থাকুক না কেন?

১৬. যেখানে বন্ধু নিজেই পর্দাবৃত, সেখানে বাক্যালাপ ছাড়া ধৈর্য ধারণ কী করে সম্ভব হতে পারে?

১৭. কিন্তু (এসকল কথা) কেবল সে জানে, যে ভালবেসে প্রেমের পরম মার্গে উপনীত রয়েছে।

১৮. প্রেমিকদের সাথে সম্পর্ক থাকে সৌন্দর্যের, মূল্যায়ন বা কদর-দান ছাড়া সুন্দর দৃশ্যের মূল্যই বা কী?

১৯. প্রেমিক সে, যে নিজেকে হারায়, প্রেমের জগতে আমিত্ব নিন্দনীয়।

২০. কিন্তু সেই অহংকার এবং আমিত্বকে মূল হতে উৎপাটন করা খোদার ওহী ছাড়া সম্ভব নয়।

২১. যে ব্যক্তি প্রিয় বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সাধ পেয়েছে, স্বর্গীয় ওহীর কল্যাণেই তার তা লাভ হয়েছে।

২২. এলহামের মাধ্যমে প্রেম পৃথিবীতে এসেছে, এলহামের কল্যাণে বেদনাও আগ্নেয়গিরিতে রূপ নিয়েছে।

২৩. আগ্রহ, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া ও বিশ্বস্ততা, সবকিছুর সৌন্দর্য এলহামের মাধ্যমেই আলোক উদ্ভাসিত হয়।

২৪. খোদাকে যে-ই পেয়েছে, এলহামের কল্যাণেই পেয়েছে আর প্রত্যেক দীপ্তিমান চেহারা, এলহামের মাধ্যমেই ডগমগ করেছে।

২৫. তুমি প্রেমজগতের লোক নও, তাই বন্ধুর বাক্যালাপের বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর।

২৬. প্রেম বন্ধুর সাথে বাক্যালাপের দাবি রাখে, যাও এক প্রেমিককে প্রেমের এই রহস্য জিজ্ঞেস কর।

২৭.একথা বলিস না যে, আমরা যেহেতু তাঁর দরগাহ থেকে দূরে, তাই আমাদের মত মাটির ঢেলার সাথে কীভাবে তার সম্পর্ক রচিত হতে পারে?

২৮. আলোকিত হৃদয় জানে যে, খোদার সন্ধান মানব-প্রকৃতির আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য।

২৯. খোদাকে ছাড়া হৃদয় কোনভাবে স্বস্তি পেতে পারে না, আদি থেকে মানব প্রকৃতিতে এমনই চলে আসছে।

৩০. প্রেমাস্পদের সাথে বাক্যালাপ ছাড়া হৃদয় শান্তি (ধৈর্য) পায় না, আদি থেকে (তার প্রকৃতিতে) খোদা এই বীজ বপন করে রেখেছেন।

৩১. (সেই সত্তা) যিনি মানবকে এমন প্রকৃতি দান করেছেন, তিনি কীভাবে তার প্রকৃতিগত উৎকর্ষ এ বৈশিষ্টকে নষ্ট করতে পারেন?

৩২. খোদার কাজ মানুষ কীভাবে করতে পারে? একটি তুচ্ছ কীট দ্বারা কীভাবে খোদার কাজ সাধিত হতে পারে?

৩৩. আমরা সবাই অজ্ঞ আর তিনি সকল রহস্য সম্পর্কে অবহিত। আমরা সবাই অন্ধ আর তিনি চক্ষুষ্মান।

৩৪. খোদার সামনে বুদ্ধিমত্তা বা প্রজ্ঞার দাবি করা কঠিন অজ্ঞতা ও উম্মাদনার পরিচায়ক।

৩৫. প্রদীপ্ত সূর্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, এই ধারণায় যে, আমি নিজের ভেতর থেকে নিজেই আলো বের করবো,

৩৬. এক এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে এই ধারণা অন্ধ করে দিয়েছে আর ভ্রষ্টতা বা ধ্বংসের কূপে উল্টো করে নিক্ষেপ করেছে।

৩৭. যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অহংকার করো না, এই (অলীক) বুদ্ধিমত্তা তোমার পথে একটি প্রতিমা-স্বরূপ।

৩৮. অহংকারে কলুষিত বুদ্ধি, মানুষের নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ একে বুদ্ধিমত্তা মনে করে।

৩৯. অহংকার বুদ্ধির শহরকে বিরান করে দেয় আর বুদ্ধিমানদেরকে পথভ্রষ্ট ও অজ্ঞ করে তুলে।

৪০. যা অহংকার ও আত্মশ্লাঘাকে বৃদ্ধি করে, হে ভ্রষ্ট! তা তোমাকে খোদা পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাতে পারে?

৪১. আত্মগর্ব তোমাকে শিরকে লিপ্ত করবে, হে লোক-দেখিয়ে বেড়ানো অভ্যস্ত ব্যক্তি! অহংকার পরিত্যাগ কর আত্মম্ভরিতা থেকে তওবা করো।

৪২. সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থাকে মুশরেক আর খোদার চিরস্থায়ী রহমত হতেও থাকে বিতাড়িত বহু দূরে।

৪৩. খোদাকে কেবল খোদার সাহায্যেই পাওয়া সম্ভব। কোন ষড়যন্ত্র, ধূর্ততা, পরিকল্পনা ও কৌশলের মাধ্যমে তাঁকে পাওয়া যায় না।

৪৪. যতদিন ছোট্ট শিশুর ন্যায় খোদার পানে না যাচিবে, ততদিন তোমার পেয়ালা কেবল তলানী (কাদা) সর্বস্বই হবে।

৪৫. খোদার কল্যাণরাজি লাভের জন্য অনুনয়-বিনয় হলো শর্ত। পানিকে কেউ উচু যায়গায় স্থির থাকতে দেখেনি।

৪৬. খোদা বিনয় পছন্দ করেন, অহংকারের কোন স্থান সেখানে নেই। নিজ ডানায় ভর করে তাঁর দ্বারে পৌঁছা সম্ভব নয়।

৪৭. মহামহিমান্বিত গৌরবমণ্ডিত সেই সত্ত্বা বিনয়ীদেরকে লালন-পালন করেন। বিদ্রোহীরা চির-বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাতই থাকে।

৪৮. যতক্ষণ তুমি সূর্যের আলোতে না আসবে, পর্দার অন্তরালে কীভাবে তোমার ওপর আলো পড়তে পারে?

৪৯. হে স্নেহভাজন তোমার অঞ্জলিতে কেবল লোনা পানিই রয়েছে, যদি কিছুটা পার্থক্যশক্তি থাকে, তাহলে গর্ব করিস না।

৫০. কেবল প্রেমাস্পদের পক্ষ হতেই তুমি জীবন-সুধা লাভ করতে পার। যদি জীবনের প্রত্যাশী হও তাহলে যাও তাঁর কাছে চাও।

৫১. সেই জীবন-সুধা এখন সম্পূর্ণভাবে দুষ্প্রাপ্য, এর পথ 'স্বর্গীয় প্রদীপ' ব্যতিত কেউ পায়নি।

৫২. সে সকল ধ্যান-ধারণা, যাতে তুমি নিজ বুদ্ধিবলে উপনীত হও, এর আলোও খোদার ওহীর মাধ্যমেই লাভ হয়।

৫৩. যেহেতু তোমার আধ্যাত্মিক চোখ খোলা নয়, তাই তোমার হৃদয় এ রহস্য সম্পর্কে অনবহিত।

৫৪. 'আমি স্বয়ং বড় বুদ্ধিমান' এটি মনে করা খোদার প্রতি বিদ্রোহের শামিল (আমার তাঁর ওহীর কোন প্রয়োজন নেই, কেননা আমি স্বয়ং বড় বুদ্ধিমান)।

৫৫. তোমার স্খলন তোমাকে ভিখারী বানিয়ে ছাড়বে আর নিমেষে তোমার বুদ্ধি তোমাকে লাঞ্ছিত করবে।

৫৬. বাইরে থেকে তোমার বুদ্ধি সাদা-শুভ্র সমাধির ন্যায়, অথচ এর ভেতরে একটি শোচনীয় অবস্থার লাশ ব্যতীত আর কিছু নেই।

৫৭. বুদ্ধির পরম মার্গ হলো খোদার শিক্ষা, আর নবীদের পক্ষ হতেই সকল সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৫৮. যে-ই জ্ঞান লাভ করেছে, শিক্ষার মাধ্যমে করেছে, যে চেহারা খোদা বিমুখ

হয় না, সেই চেহারাই জ্যোতির্মন্ডিত হয়ে গেছে।

৫৯. বাস্তব অবস্থার নিরিখে সময় তোমাকে বলছে যে, হে ক্ষণস্থায়ী মানুষ এক শিক্ষকের আঁচল আকড়ে ধর।

৬০. যারা দুর্বলাবস্থায় জন্ম নেয়, তাদের প্রকৃতিও দুর্বলই হয়ে থাকে। যদি তোমার কান থাকে, তবে নসীহতের একটি শব্দই যথেষ্ট।

৬১. খোদা ভুল-ভ্রান্তি মুক্ত আর তুই মূর্তিমান ভ্রান্তি, বিবাদ-বিসম্বাদ ছেড়ে দে, বরং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

৬২. তোমার বিবেক-বুদ্ধি শত লোভ-লিপ্সা ও কামনা-বাসনার কাছে পরাস্ত, পরাজিত শক্তির ওপর নির্ভর করা দুর্ভাগাদের কাজ।

৬৩. সকল যদু-মধুর কাছ থেকে তুমি শিখতে থাক, অথচ সেই এক-অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাবানের কাছে যেতে তোমার লজ্জা।

৬৪. অহংকার-বশত তুমি সত্যের পথ ছেড়ে দিয়েছ, এ তুমি কী করলে? এ কেমন বীজ তুমি বপন করলে?

৬৫. হে নিষ্ঠুর! ইনি আমাদের সেই মনিব, এই আকাশ ও পৃথিবীর সবই তাঁর দানের অংশ।

৬৬. তিনি মেঘ, বৃষ্টি, চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন আর গ্রীস্ম ও শীত সৃষ্টি করেছেন,

৬৭. যেন তাঁর অনুগ্রহে আমাদের অন্নের ব্যবস্থা হয়, জীবিত থাকতে পারি আর আমাদের দৈহিক লালন-পালনের ব্যবস্থা হয়।

৬৮. যিনি আমাদের দেহের প্রতি এই পরম অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আত্মাকে কিভাবে অনুগ্রহ-বঞ্চিত রাখতে পারেন?

৬৯. প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে তোমাকে আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুরআনের ওহী হলো খোদার চৌম্বকশক্তি।

৭০. কুরআন প্রচ্ছন্ন শিরক দূর করার মাধ্যম, যেন তুমি খোদার নিদর্শন খোদার পক্ষ থেকে সরাসরি পেতে পার।

৭১. যেন তুমি অহংকার, গর্ব ও আত্মশ্লাঘা হতে মুক্তি পেতে পার, যেন তুমি খোদার কৃপার জন্য কৃতজ্ঞ হতে পার।

৭২. অহংকার পরিহার কর, যেন তিনি দয়াদ্র হতে পারেন, দাসত্ব বরণ কর, কেননা তার দাসত্ব আবশ্যক।

৭৩.জীবন, মৃত্যু বিনয় ও ক্রন্দনের মাঝে নিহীত। খোদার পথে যে মৃত্যুকে বরণ করে, সে অবশেষে সে জীবন লাভ করে।

৭৪. আত্ম-বিলুপ্তির সুরাই হলো অমৃত-সুধা যে সেটি পান করেছে, সে মৃত্যু হতে মুক্তি লাভ করেছে

৭৫. বুদ্ধিমান সে, যে বন্ধুর সন্ধানে রত থাকে আর বিনয় ও আকুতি-মিনতির মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করে।

৭৬. নির্বুদ্ধিতা সেই বুদ্ধি ও ধূর্ততা হতে শ্রেয়, যা তোমাকে অহংকার ও অহমিকার কূপে নিক্ষেপ করে।

৭৭. সত্য সন্ধানী হও আর অহংকার থেকে বেরিয়ে যাও খোদার দোহাই, আমিত্ব পরিহার কর।

৭৮. আমি জানি না, এটি কেমন ঈমান ও কেমন ধর্ম যে, বিশ্বপ্রতিপালকের সামনে বড় বড় কথা বল।

৭৯. কোথায় তুই আর কোথায় সেই সর্বশক্তিমান খোদা! তওবা কর আর এমন নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করিস না।

৮০. যদি খোদার কল্যাণপ্রবাহের ছিঁটা-ফোটা এক মূহুর্তের জন্যও হ্রাস পায়, তাহলে পুরো সৃষ্টি ও বিশ্বজগত ধ্বংস হয়ে যাবে।

৮১. হে হীন! বড় বড় কথা বলো না আর নিজের পা নিজের চাঁদরের বাইরে বের করো না। অর্থাৎ নিজের সাধ্যের বাইরে কথা বলো না।

৮২. ইবাদতকারী সে যে তাঁর দরবারে আত্মবিলীন হয় আর তত্ত্বজ্ঞানী সে, যে তাঁকে অদ্বিতীয় আখ্যা দেয়।

৮৩. তুমি নিজেকে পুণ্যবান জ্ঞান কর, হে হতভাগা! খোদা তোমাকে হিদায়াত দিন, তুমি কত(ভয়াবহ) ভুল ধারণায় নিমজ্জিত!

৮৪. তুমি কেন এত বেশী উড়ছ? নাকি তুমি সেই অনন্য সত্তার অস্বীকারকারী?

৮৫. কী দেখে তুমি এই পার্থিব জীবনের উপর নির্ভর করছ? এই নশ্বর মুসাফিরখানা কী তোমার ভাল লেগে গেছে?

৮৬. বুদ্ধিমান কেন এর মোহে আচ্ছন্ন হবে? এখান থেকে যে হঠাৎ করে বের হতে হবে।

৮৭. এ পৃথিবীর জন্য খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, এটিই তো দুর্ভাগাদের পরিস্কার লক্ষণ।

৮৮. কারো প্রতি যখন খোদার অনুগ্রহ হয়, পৃথিবীতে তার মন আর বেশী বসে না।

৮৯.বিবেক-বুদ্ধি খাটাও। এই পৃথিবী ক্ষণ-ভঙ্গুর, খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। কেননা, অবশেষে তুমি খোদারই মুখোমুখী হবে।

৯০.যদি তুমি নিজ হাতেই প্রাণ-হারী বিষ খাও, তাহলে আমি কীভাবে বুঝবো যে, তুমি বুদ্ধিমান?

৯১. সে সকল লোকদের দেখ, যারা নিজেদের বিলীন করে দেয় আর খোদার নির্দেশের খাতিরে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেয়।

৯২. তারা নাম, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয়ে উদাসীন, তারা খোদা প্রেমে বিভোর আর মাথার পাগড়ী সম্পর্কে (অর্থাৎ সম্মান সম্পর্কে) তারা ভ্রুক্ষেপহীন।

৯৩.অহংকার ছেড়ে তারা খোদার সত্ত্বায় একাকার হয়ে গেছে, তাঁর চেহারা দর্শনের জন্য সম্মান-মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়েছে।

৯৪. তাদের দর্শন লাভ করা খোদাকে স্মরণ করায় মহীয়ান-খোদার দরবারে তারা নিষ্ঠাবান।

৯৫. নিজেকে বড় মনে করে তুমি (অহংকারে) মাথা উঁচিয়ে বান্দাদের পথ ছেড়ে দিয়েছ।

৯৬. তোমার জীবনে বিনয় যতদিন স্পষ্টভাবে সৃষ্টি না হবে, ততদিন তাতে ঐশী জ্যেতি কিভাবে দেদীপ্যমান হতে পারে?

৯৭. তুমি নিজেই চিন্তা কর, শস্যদানা যতদিন মাটির সাথে মিশে না যাবে ততদিন এক থেকে হাজার কি করে উৎপন্ন হবে?

৯৮.সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলীন হও যেন তোমার প্রতি কল্যাণরাজি বর্ষিত হয়। প্রাণ উৎসর্গ কর, যেন দ্বিতীয় জীবন লাভ করতে পার।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩৯তম কিস্তি)

দ্বিতীয় ধাপ ঃ বেহেশ্‌তি ও দোজখিদের জন্য প্রথম বর্ণিত ধাপটির ঊর্ধ্বে এবং জান্নাত বা দোজখে প্রবেশের পূর্বে মধ্যবর্তী আরেকটি ধাপ রয়েছে। এটি 'হাশর'-এর পরে এবং (জান্নাতিদের) 'জান্নাতে উয্‌মা' তথা বৃহত্তম ও পূর্ণাঙ্গীন জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে কিংবা (জাহান্নামীদের) 'জাহান্নামে কুব্‌রা' তথা বৃহত্তম ও কঠোরতম জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে হাসিল হয়ে থাকে। এ ধাপটিতে জান্নাতি কিংবা জাহান্নামী উভয় শ্রেণীর লোক নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী তাদের বর্ধনশীল শক্তিনিচয়ে উচ্চতর মাত্রায় তীব্রতার সৃষ্টি হয়ে এবং ঐশী করুণা কিংবা ঐশী- ক্রোধের 'তাজাল্লি' (বিকাশ-প্রকাশ) পূর্ণাকারে পরিদৃষ্ট হয়ে এবং 'জান্নাতে-উযমা'কে অতি নিকটে পেয়ে সেই সব সুস্বাদ উন্নত মানে কিংবা 'জাহান্নামে কুব্‌বা'কে খুবই কাছে দেখতে পেয়ে সেই সব শাস্তি ও দুর্ভোগ বর্ধিত হারে আরও বাড়তে থাকে। যেমন আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' স্বয়ং বলেন ঃ (১) **'ওয়া উয্‌লিফাতিল জান্নাতু লিল্‌মুত্তাক্বীন ওয়া বুর্‌রিযাতিল্ জাহীমু লিল্ গাবীন।** [(আশ্ শু'আরা ঃ ৯১, ৯২) অর্থাৎ, 'আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে এবং বিপথগামীদের জন্য জাহান্নামকে প্রকটিত করা হবে')] (২) **'উজূহুইঁ ইয়াওমায়িযিন মুস্‌ফিরাতুন যাহিকাতুন মুসতাবাশিরাহ্ ওয়া উজূহুইঁ ইয়াওমায়িযিন আলাইহা গাবারাতুন তারহাকুহা ক্বতারাহ্ উলাইকা হুমুল-কাফারাতুল-ফাজারাহ্।"** [(সূরা আবাস ঃ ৩৯-৪৩)) অর্থাৎ, 'সেদিন কতগুলো চেহারা হবে উজ্জল, হাসি-মুখ (ও) আনন্দিত। আর সেদিন কতগুলো চেহারা হবে ধূলোমাখা। কালিমা সেগুলোকে ছেয়ে ফেলবে। এরাই অস্বীকারকারী, পাপাচারী'] এ দ্বিতীয় ধাপটিতেও মানুষ সবাই সমান নয়। বরং উচ্চ ও উত্তম পর্যায়েরও হবে, যারা বেহেশ্‌তবাসী হওয়া অবস্থায় বেহেশ্‌তের দ্যুতি ও জ্যোতিসমূহের অধিকারী হবে।

এঁদেরই প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"নূরুহুম ইয়াস্'আ বাইনা আইদিহিম ওয়া বি-আইমানিহিম।"** [(সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৯) অর্থাৎ, 'তাদের নূর তাদের সামানেও ধাবিত হবে এবং তাদের ডান দিকেও। অনুরূপভাবে দোজখী সাব্যস্ত হওয়া অবস্থায় যারা চরম পর্যায়ের অস্বীকারকারী (অবিশ্বাসী) হয়ে থাকে তারা পুরোপুরি দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাদের হৃদয়পটে দোজখের আগুন প্রজ্জলিত করা হয়। যেমন, আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' বলেন ঃ **"নারুল্লাহিল মুক্বাদাতুল্‌লাতি তাত্তালিউ আলাল্ আফ্‌য়িদাহ্।"** [(সূরা আল হুমাযাহ্ ঃ ৭, ৮) অর্থাৎ, 'এটা আল্লাহ্‌র জ্বালানো আগুন যা হৃদয়সমূহে আঁছড়ে পড়বে।]

অতঃপর উল্লিখিত ধাপের ঊর্ধ্বে শেষ ধাপটিই হচ্ছে **তৃতীয় ধাপ**। এটিই চূড়ান্ত ও সব ধাপের শেষ সীমা যেখানে 'হিসাব-নিকাশ দিবস' বা হাশর শেষে মানুষ প্রবেশ করেব এবং পূর্ণ মাত্রায় সৌভাগ্যের কিংবা দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের স্বাদ গ্রহণ করবে। মোদ্দাকথা, উল্লিখিত তিনটি ধাপেই মানুষ একরকম বেহেশ্‌তে কিংবা এক প্রকার দোজখে অবস্থান করে। প্রকৃত অবস্থা যখন এটাই, তখন এমতাবস্থায় স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, উল্লিখিত ধাপ ও স্তরগুলোর কোনোটিতে অবস্থানকালেই

মানুষ বেহেশ্‌ত কিংবা দোজখ থেকে বহিষ্কৃত হয় না। তবে সংশ্লিষ্ট কোনো ধাপ বা স্তর থেকে যখন কেউ উত্তীর্ণ হয়ে উন্নতি লাভ করে তখন সে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে ওঠে যায়।

উল্লিখিত উন্নতি লাভের এ-ও একটি রূপ যে, উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি যখন ঈমান ও আমলের অতি সামান্য অবস্থানেই মারা যায়, তখন তার জন্য বেহেশ্‌তের দিকে সামান্য একটি ছিদ্রপথ খোলা হয়। কেননা 'বেহেশ্‌তি তাজাল্লি' তথা স্বর্গীয় জ্যোতির্বিকাশের সে-পরিমাণেই তার মাঝে ধারণক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। এরপর, সে যদি সৎ-পুণ্যবান সন্তান রেখে মারা যেয়ে থাকে–যারা যথাসাধ্য চেষ্টায় তার মাগফিরাতের নিয়্যতে খয়রাত গরীব-মিসকিনদের দান করে, অথবা এমন কোনো 'আল্লাহ্ ওয়ালা' বুযূর্গ যাঁকে সে ভালবাসতো তিনি কাতরভাবে তার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন অথবা পরলোকগত সে-ব্যক্তি যদি ইহকালে কোনো জনহিতকর কাজ করে থাকে, যার দরুন আপামর জনসাধারণ উপকৃত হয়, এর বদৌলতে জান্নাত অভিমুখে তার জন্য উন্মোচিত জানালাটি দৈনন্দিন প্রশস্ততর হতে থাকবে এবং **'সাবাক্বত্ রাহ্‌মাতি আলা গাযাবি'** (অর্থাৎ, 'আমার করুণা আমার ক্রোধের ওপর প্রবল হয়ে থাকে)- হাদীস সম্পর্কিত ঐশী অভিপ্রায় সেটিকে প্রশস্ততর করতে থাকে। এমনকি, সে-জানালা একটি সুপ্রশস্ত দরজায় পরিণত হয়ে অবশেষে এ বিষয়টি এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, শহীদ ও সিদ্দীকগণের মতো সে-ব্যক্তি বেহেশ্‌তেই প্রবেশ লাভ করে। এ বিষয়টি প্রত্যেক সুবোধ ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন যে, শরীয়ত ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের দিক দিয়ে এবং জ্ঞান-বুদ্ধির নিরিখে এটা এক অহেতুক ধারণা যে, একজন পরলোকগত সৎ মুসলমানের জন্য তার অন্তর্ধানের পর এক প্রকার কল্যাণধারা প্রবহমান থাকা সত্ত্বেও এবং তার জন্য সওয়াব ও সৎকাজের সুফলসমূহ উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও বেহেশ্‌তের দিকে উন্মোচিত জানালাটির প্রশস্ততা চিরকাল কেবল সেটুকুই থাকবে যেটুকু তার মৃত্যুর পরে পরে প্রথম দিন খোলা হয়েছিল!

স্মরণ রাখা উচিত, খোদা তা'লা এ জানালাটি খোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকে এর এতো আয়োজন করে রেখেছেন যাতে সুস্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে এ মহানুভব ও পারম করুণাময় খোদার প্রকৃতপক্ষে এ ইচ্ছাই রয়েছে যে এক কণা পরিমাণ ঈমান ও আমল নিয়েও যদি কেউ তাঁর দিকে যাত্রা করে তাহলে সে-কণা পরিমাণটুকুও পরিপোষণ ও প্রবৃদ্ধি লাভ করবে। আর যদি কোনো ঘটনাচক্রে সেইসব কল্যাণধারা যা মৃতব্যক্তিকে এ জগতের দিক থেকে পৌঁছানো হয় তা যদি দুষ্প্রাপ্য হয় তবুও এসব উপাদান কখনও রহিত বা উধাও হতে পারে না।

কেননা সকল মু'মিন-পুণ্যবান এবং শহীদ ও সিদ্দীকগণের পক্ষে তাগিদপূর্ণ এ নির্দেশ রয়েছে, সকল মু'মিন যেন তাদের সেইসব ভাইয়ের জন্য সর্বান্তঃকরণে মাগফিরাত কামনায় দোয়া করতে থাকেন যারা তাদের পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করেছেন। এটা স্পষ্ট যে যাদের উদ্দেশ্যে বিরাট সংখ্যক মু'মিন যখন দোয়া করে থাকেন তখন সে-দোয়া কখনও বৃথা যাবে না বরং এ সমস্ত দোয়া প্রতিনিয়ত কাজ করছে এবং পরলোকগত গোনাহগার ও দুর্বল মু'মিনদের জন্য বেহেশ্‌ত অভিমুখে উন্মুক্ত জানালাগুলোকে জোরে-শোরে সুপ্রশস্ত করে চলেছে। আর প্রথমে যে তাদের ক্ষুদ্র-পরিসর জানালা বেহেশ্‌তের দৃশ্যাবলী অবলোকনের উদ্দেশ্যে দান করা হয় সেটিকে উল্লিখিত এ সকল দোয়া ও অপরাপর কল্যাণমূলক উপাদান নিশ্চয়ই প্রশস্ততর করে প্রকারান্তরে তাদের জান্নাতে পৌঁছে দেয়।

এ যুগের ওই সব মুসলমান যারা নিজেদের তৌহীদবাদী বলে অভিহিত করে থাকেন তারা এ ধোকারও শিকার হয়ে আছেন যে তারা বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পরে পরে বেহেশ্‌তে প্রবেশ লাভকারী হবেন কেবল শহীদগণ। আর বাকি সমস্ত মু'মিন– এমন কি, নবী-রসূলগণকে 'হিসাব-নিকাশ দিবস' পর্যন্ত বেহেশ্‌তের বাইরে রাখা হবে। তাঁদের জন্য বেহেশ্‌তের দিকে কেবল একটি জানালা খোলা হবে। কিন্তু তাঁরা (তথাকথিত তৌহিদবাদী) এ বিষয়টির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি যে, নবী ও সিদ্দীকগণ কি রূহানী বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শহীদদের থেকে উন্নততর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নন? বেহেশত থেকে দূরে থাকা কি এক ধরণের আযাব নয়? এটা কখনও মাগফিরাতপ্রাপ্ত পূত-পবিত্র ব্যক্তিদের সপক্ষে সাব্যস্ত করা যায় না। আর যাঁর সপক্ষে খোদা তা'লা বলেন, **"রাফাআ বা'যাহুম দারাজাত"** [অর্থাৎ, 'কতক আছেন যাদের তিনি মর্যাদায় বহুগুণ উন্নীত করেছেন' (আলা বাকারাহ ঃ ২৫৪) –অনুবাদক] এমন ব্যক্তি তথা (নবী করীম (সা.) কি সৌভাগ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে পারেন?!

আফসোস, এ লোকগুলো ইসলামের দ্বীপ্তিমান শরিয়ত বিধানকে উল্টে দিয়েছে!! এঁদের ধারণায় সবার আগে বেহেশ্‌তে প্রবেশ লাভকারী হবেন শহীদগণ! আর গণনাতীত বছর বা যুগের পর কোনো সময় নবী ও সিদ্দীকগণেরও (বেহেশ্‌তে যাওয়ার) পালা আসবে!! এই মানহানি ও মর্যাদা হননের অভিযোগ উল্লিখিত এ লোকদের ওপর এতো গুরুতর যা দুর্বল ও অসার অজুহাত দেখিয়ে দূর করা যায় না। নিঃসন্দেহে একথাটি অবশ্যই বোধগম্য হতে পারে যে, ঈমান ও আমলে যাঁরা অগ্রগামী, জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরাই অগ্রগণ্য ও আগ্রগামী হওয়া উচিত। এমনটি হতে পারে না যে, তাঁদের জন্য দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকদের মতো কেবল জানালা খোলা হবে এবং শহীদ ব্যক্তিগণ দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া মাত্র বেহেশ্‌তের সব

রকম ফল বেছে বেছে খেতে আরম্ভ করবেন! বেহেশ্‌তে প্রবেশলাভ যদি পরিপূর্ণ ঈমান, পরিপূর্ণ আন্তরিক নিষ্ঠা এবং পরিপূর্ণ ও প্রাণপণ চেষ্টার ওপর নির্ভারশীল হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে নবী ও সিদ্দীকগণের চেয়ে অন্য কেউ এগিয়ে নেই –যাঁদের গোটা জীবন খোদা তা'লার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত হয়ে থাকে। তাঁরা খোদা তা'লার পথে এমন আত্মোৎসর্গকৃত হয়ে থাকেন যেন সারাক্ষণ প্রাণ বিসর্জন করছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। বরং তাঁরা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যাতে খোদা তা'লার পথে শাহাদত বরণ করেন। এরপর জীবিত হয়ে পুনরায় শাহাদত বরণ করেন।

এখন আমার এই পুরো বর্ণনাটিতে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হল যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার জন্য এমন সব জোরালো উপায়-উপকরণ মওজুদ রয়েছে যদ্দুরুণ মু'মিনগণ প্রায় সবাই 'হিসাব-নিকাশ দিবস'-এর পূর্বে বেহেশ্‌তে পুরোপুরি প্রবেশলাভ করবেন এবং 'হিসাব-নিকাশ'-এর দরুন বেহশ্‌ত থেকে তাঁদের বের হতে হবে না। বরং তখন বেহেশ্‌ত তাঁদের আরও নিকটবর্তী হবে। জানালার দৃষ্টান্তটি থেকে অনুধাবন করা উচিত, বেহেশ্‌তকে কীভাবে কবরের নিকটবর্তী করা হয়। ব্যাপারটি কি এমন যে, কবরের সংলগ্ন কোনো জমি বা ভূ-খন্ড পড়ে আছে, যেখানে বেহেশ্‌ত এসে উপস্থিত হয়? কক্ষনো এমনটি নয়। বরং রূহানীভাবে নিকটবর্তী করা হয়। তেমনি রূহানীভাবে বেহেশ্‌তবাসী হিসাব-নিকাশ বা হাশরের ময়দানেও অবস্থান করবেন। সেই সাথে বেহেশ্‌তেও অবস্থান করবেন। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার কবরের নিচে বেহেশ্‌তের 'রওজা' (বাগান) রয়েছে।' এ পবিত্র বাণীটিতে খুব গভীরভাবে চিন্তা করুন, কিসের ইঙ্গিত দান করে এটি?

আর উযায়র (আ.)-এর মারা যাওয়া এবং এর একশ' বছর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কিত (বৃত্তান্তমূলক) যুক্তিটি বিপক্ষীয় মতাবলম্বীর পক্ষে কোনো কাজে আসবে না। কেননা, কোথাও বর্ণিত হয় নি যে, উযায়রকে জীবিত করার পর পুনরায় তাঁকে 'দারুল ইব্‌তিলা' তথা পরীক্ষাগার স্বরূপ এ দুনিয়ায় পাঠানো হয়। এতে করে (কুরআন বিরুদ্ধ) এই ত্রুটির আবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভব ঘটতো যে, তাঁকে বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বরং সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর আক্ষারিক অর্থ গ্রহণ করলে কেবল এটাই প্রমাণিত হবে যে, খোদা তা'লা তাঁর কুদরতমূলক নিদর্শনস্বরূপ এক মুহূর্তের জন্য উযায়রকে পুনরায় জীবিত করে দেখান যাতে উযায়রকে তিনি তাঁর অসীমক্ষমতায় দৃঢ়বিশ্বাসী হওয়ার শিক্ষাদান করেন। কিন্তু দুনিয়ায় তার এই আসাটিও ক্ষণস্থায়ী ছিল। বরং প্রকৃতপক্ষে উযায়র (আ.) বেহেশ্‌তেই অবস্থিত ছিলেন। জানা উচিত, সকল নবী ও সিদ্দীক মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হয়ে থাকেন এবং একটি জ্যোতির্ময় দেহ তাঁদের দান করা হয়। কখনও কখনও জাগ্রত অবস্থায় (পরলোকগত) সত্যপরায়ণ-পুণ্যবানদের সঙ্গে সাক্ষ্যলাভও করে থাকেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে এ অধম নিজে অভিজ্ঞতা রাখে। অতএব খোদা তা'লা যদি উয়ায়র (আ.)-কে পুনর্জীবিত করে থাকেন তাহলে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এই পুনর্জীবন থেকে যদি এ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হয় যে, তিনি জীবিত হয়ে বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তাহলে নিঃসন্দেহে এটি এক আশ্চর্য রকম অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। বরং উল্লিখিত পুনর্জীবনের দরুন বেহেশ্‌তে 'তজল্লি' (জ্যোতির্বিকাশ) শ্রেয়ত বেড়ে যায়।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

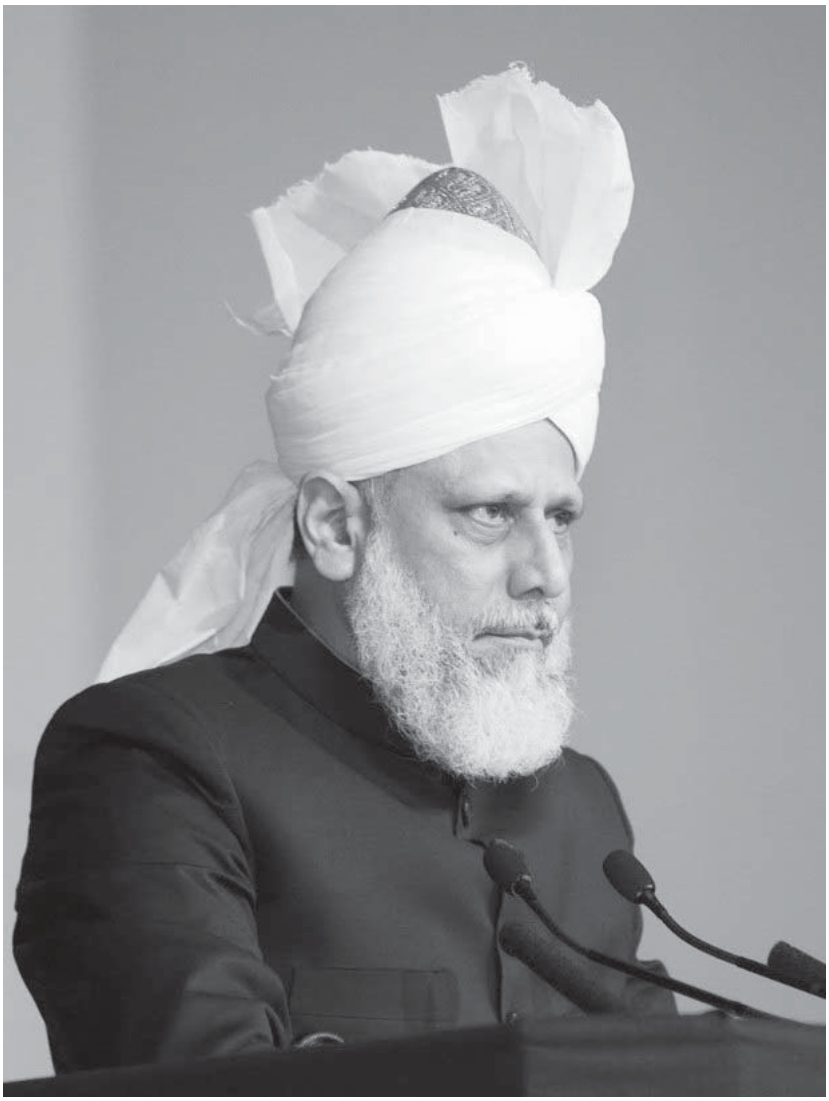

জুমুআর খুতবা

রমযান-এ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আকর্ষণ করা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ জুন, ২০১৫ মোতাবেক ১৯ এহসান, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আশিসমণ্ডিত জুমুআর দিন এবং রমযানের বরকতময় মাসের প্রথম রোযা। অতএব, আজকের এই দিনটি অশেষ কল্যাণরাজি নিয়ে উদিত হয়েছে। জুমুআর দিন বরকতময় হওয়া সম্পর্কে মহানবী (সা.) একটি স্থায়ী সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যাতে মু'মিন যে দোয়াই করে তা গৃহীত হয়। (সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুল জুমুআ, বাব আস্ সাআতুল্লাতি ফি ইয়াওমিল জুমুআ, হাদীস নম্বর: ৯৩৫)

রমযানের কল্যাণ

আর রমযান সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেছেন, যখন রমযান মাস আসে, জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হয়, আর দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। (সুনান আত্ তিরমিযী, কিতাবুস্ সওম, বাব মা জাআ ফি ফাযলে শাহরে রামাযান, হাদীস নম্বর: ৬৮২)

অতএব, এই মাসে বিশেষভাবে খোদার

করুণারাজি উদ্বেলিত হয়ে উঠে, আর মু'মিনদের উপর খোদার রহমত এবং কৃপাবারি বর্ষিত হয়। তবে একই সাথে মহানবী (সা.) এই কৃপারাজি আকর্ষণের জন্য কতিপয় শর্তেরও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এ দিনগুলোতে যেন অহেতুক কথা-বার্তা না বলা হয়, কোন হৈচৈ বা হট্টগোল যেন না হয়, কোন গালিগালাজ বা ঝগড়া-বিবাদও যেন না হয়। প্রত্যেক মন্দ কাজের উত্তরে একজন রোযাদারের একথাই বলা উচিত যে, **'আমি রোযা রেখেছি।'** (সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুস্ সওম, বাব ফাযলুস্ সওম, হাদীস নম্বর: ১৮৯৪)

আর আমি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এসব অনিষ্ট এড়িয়ে চলছি। এমন অবস্থা হলেই প্রকৃত অর্থে রোযা গণ্য হবে অর্থাৎ মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে ও খোদার নির্দেশাবলী অনুসারে এ মাসে জীবন অতিবাহিত করে।

রমযান মাসের গুরুত্ব কী? রোযা কাদের জন্য আবশ্যক? রোযা কীভাবে রাখা উচিত? রমযানের কী কী বিধি-নিষেধ রয়েছে?-এ বিষয়গুলোকে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গৃহীত হওয়ার সাথে এভাবে সম্পৃক্ত করেছেন, তিনি বলেন:

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ, আমার বান্দা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাদের বল, আমি তাদের নিকটে আছি। এক প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই বা দোয়া কবুল করি, তাই দোয়াকারীরও উচিত হবে আমার নির্দেশ মেনে চলা এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যেন তারা হিদায়াত বা সুপথ প্রাপ্ত হয়।

তিনি আরো বলেন, রমযান মাস এতই কল্যাণময় যে, এ দিনগুলোর ইবাদতের পর আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞে স করে, তখন বল, আমি অতি সন্নিকটে।

اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ আহ্বানকারী বা প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার দোয়া গ্রহণ করি। কাজেই, রমযান মাসে যে জুমুআগুলো আসে তা দ্বিগুণ গুরুত্ববহ। রমযানের এই সময় দিবাকালও দোয়া গৃহীত হওয়ার সময় আর রাতও দোয়া কবুল হওয়ার সময়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা জান না, কোন্ মুহূর্তটি দোয়া গৃহীত হওয়ার মুহূর্ত, তাই দিনের বেলাও দোয়ায় অতিবাহিত কর আর রাতও। অতএব, এ দিনগুলো থেকে যত বেশি সম্ভব লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। একটি হল, সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা এ মাসে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে জান্নাতের দ্বার খুলে দিয়েছেন এবং বান্দার নিকটে এসে গেছেন। আর দ্বিতীয়তঃ রমযানের জুমুআ থেকেও সমধিক ফায়দা বা কল্যাণ অর্জন করা উচিত। কিন্তু এই দিনগুলোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা পরম বিনয়ের সাথে, বিশুদ্ধ চিত্তে ও মিনতির সাথে খোদার কাছে মানুষের করা উচিত, তা হল, হে আল্লাহ্! শুধু রমযানেই নয় বরং বছরের অন্য সময়েও আমাকে সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত রাখ, যাদের দোয়া রাতেও গৃহীত হয় আর দিনেও গৃহীত হয়। রমযান যেন এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়নকারী ও তাকওয়ার উপর পরিচালনাকারী হয়, আর আমি যেন চিরস্থায়ী হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হই।

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা রোযা বিধিবদ্ধ করার উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বের বিভিনড়ব জাতির মত তোমাদের উপরও রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এটি নয় যে, যেহেতু পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি রোযা রাখত, তাই তোমরাও রোযা রাখ। বরং এই আয়াতের অর্থ হল তা, যা আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার আর আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক এবং নৈতিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাক।

অতঃপর এ স্থানে, এই আয়াতের শেষ প্রান্তে যা আমি পড়েছি, আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ

অর্থাৎ যেন তারা রুশদ্ বা হিদায়াত পেতে পারে। রুশদ্ শব্দের অর্থ হল, সঠিক এবং সোজা পথ, সঠিক কর্ম এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রাপ্ত পথ, উনড়বত চরিত্র, পরিপক্ক বোধ-বুদ্ধি ও মেধা এবং সঠিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার, আর এই অবস্থার উপর স্থায়ী হওয়া এবং দৃঢ়তা লাভ করা। অতএব, মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিশুদ্ধচিত্তে সমর্পিত হয়, এর ফলে যেখানে সে দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, সেখানে তাকওয়া এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের বিশ্বাস এবং ঈমানেও উত্তরোত্তর দৃঢ়তা লাভ করে। আর এভাবে সে খোদার কৃপারাজিতে সমৃদ্ধ হয়।

অতএব, রমযান অশেষ কল্যাণের মাস। কিন্তু এই কল্যাণরাজি সে লাভ করে, যে খোদা তা'লার নির্দেশাবলী পালন করে এবং ঈমানে সমৃদ্ধ হয়। যদি নিয়্যত কেবল এটিই হয় যে, রমযান মাসে রীতিমত জুমুআ পড়ব, এরপর ইবাদতের দিকে মনোযোগ থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না, তাহলে এটি খোদার নির্দেশ অমান্য করা আর ঈমানে দুর্বলতা প্রদর্শনের নামান্তর। অবস্থা যদি এমন দুর্বল হয়, তাহলে খোদার কাছে এই অনুযোগও করা উচিত নয় যে, আমাদের দোয়া সমূহ গৃহীত হয় নি। অতএব একজন প্রকৃত বান্দা, যে কি'না খোদার আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল, তার উচিত পরম বিনয়ের সাথে এবং নিজের দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে এ দিনগুলো দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করা। রমযান মাসে জুমুআয় উপস্থিতি, আর নামায সমূহের উপস্থিতি যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়। অনেকেই মনে করে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি এ দিনগুলোতে নিকটে এসে যাই, তাই এ দিনগুলোতে ইবাদত করাই যথেষ্ট। এটি আত্মপ্রতারণার শামিল। তাই এথেকে আমাদের মুক্ত

থাকতে হবে। পরম বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'লার দাসত্বের চেতনা নিয়ে খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। খোদা কখনও দূরে নন। তিনি সর্বত্র ও সকল সময়ে বিরাজমান। কিন্তু বান্দার ব্যক্তিগত অবস্থার মাধ্যমে এই নৈকট্যের বহিঃপ্রকাশ তখন ঘটে, যখন সে বিশুদ্ধচিত্তে এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবাইকে বর্জন করে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হয়। এমনটি যদি হয়, তবে আমাদের দোয়াও গৃহীত হবে আর আমরা সেসব কিছু লাভ করব, যা আমরা খোদা তা'লার কাছে যাচনা করি, বা যা খোদার দৃষ্টিতে আমাদের জন্য সর্বোত্তম।

অতএব, **আমাদেরকে একথা ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, পুণ্য এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। আর এতে করে ব্যক্তিগতভাবেও এবং সমষ্টিগতভাবেও আমরা ইনশাআল্লাহ্ সেই ফল লাভ করব, যা খোদা তা'লা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর যেমনটি আমি বলেছি, আমরা যদি বিনয় অবলম্বন করি, নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করি, আর খোদাকে পাওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে খোদার কৃপায় এর ফল আসবে। মানুষের মাঝে যদি ভুল-ভ্রান্তিও থাকে, সে যদি পাপী এবং অপরাধীও হয়, তবুও যতদিন তার হৃদয়ে খোদা-ভীতি থাকবে, সে যদি নিজের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে, তার অন্তরে তাকওয়া বিরাজ করে, তাহলে খোদা তা'লা তার পাপ সমূহকে ঢেকে রাখেন, আর অবশেষে একদিন তাকে তওবার তৌফিক দান করেন।**

কাজেই **এ দিনগুলোতে সবচেয়ে বেশি নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং জামা'তের সদস্যদের জন্য আমাদের এই দোয়া করা উচিত যে, আমাদের সবাই যেন আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়ায় ধন্য হয়। আমরা যখন পরস্পরের জন্য বেদনার সাথে দোয়া করব তখন ফিরিশতারাও আমাদের সাথে সেই দোয়ায় যোগ দিবে। আর রমযানের কল্যাণের প্রকৃত এবং স্থায়ী দৃশ্যও আমরা দেখতে পাব।**

তাকওয়া কাকে বলে? তাকওয়া হচ্ছে খোদা তা'লার ভয় এবং খোদা-ভীতি। যতদিন আমাদের মাঝে খোদা-ভীতি এবং খোদার ভয় থাকবে, ততদিন আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের দুর্বলতা এবং পাপ-পঙ্কিলতাকে ঢেকে রাখবেন, আর আমরা তাঁর নিরাপত্তা-বেষ্টনীর মাঝে নিরাপদ থাকব। কিন্তু এমনটি যেন না হয় যে, আমরা পাপে আরো ধৃষ্ট হয়ে যাব (আল্লাহ্ করুন আমাদের মধ্যে যেন কেউ না হয়), আমাদের হৃদয় থেকে খোদাভীতিই লোপ পাবে অথবা কারো হৃদয় থেকে হ্রাস পাবে। কিন্তু আমাদের কোন দুর্বলতার কারণে যদি পাপ হয়ে যায়, আর এরপর হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি হয় বা খোদা-ভীতি জন্মে, তাহলে খোদা তা'লা বড়ই ক্ষমাশীল। খোদা-ভীতির অর্থই হল, খোদা তা'লাকে ভালোবাসা। অতএব, যতদিন আমরা এই ভালোবাসা প্রকাশ করতে থাকব, বা হৃদয়ে যদি খোদার সেই ভালোবাসা সুপ্তও থাকে তবুও আমরা ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপদ থাকব। তবে শর্ত হল, সত্যিকার ভালোবাসা থাকা চাই, প্রতারণা বা প্রহসন যেন না হয়। হৃদয়ের স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, তাঁকে প্রতারিত করা যায় না। অন্তরে যদি ভালোবাসা থাকে, কোন না কোন সময় তা প্রকাশ পেয়েই যায়। আল্লাহ্ তা'লার ভয় কোন কোন বিষয় থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এই ভালোবাসার কারণে কষ্ট করে হলেও যদি আমরা তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলি, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা, যিনি বান্দাদের ভালোবাসার প্রতি আত্মাভিমান রাখেন, তিনি নিজ বান্দাদের ধ্বংস হতে দেন না, বরং তওবা করার তৌফিক দান করেন। কিন্তু যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, মানুষ যদি পাপে ধৃষ্ট হয়ে যায় আর তাকওয়ার বীজ যদি হৃদয় থেকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলে, তাহলে সে শাস্তি পায়। খোদার অনুগ্রহের কল্যাণে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছি। তিনি বারংবার জামা'তের সদস্যদের তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এমন এক আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে দান করেছেন, যা তাকওয়ার বীজকে সুরক্ষিত রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর প্রত্যেক বছর এই বীজের অঙ্কুরিত হওয়া এবং উনড়বতির ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই রমযান মাসকে আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া এই বীজের পরিচর্যার রীতি সম্পর্কে অবহিত করে সেটিকে ফলপ্রদ করার শুভ সংবাদও দিয়েছেন।

অতএব, **এই মাসের কল্যাণে ভূষিত হওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে খোদার বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের অযোগ্যতার কারণে আল্লাহ্ তা'লা সাময়িকভাবে আমাদের দোয়া গ্রহণ করতে বিলম্ব করলেও সেই মমতাময়ী মায়ের মত, যিনি সন্তানের সংশোধনের খাতিরে ক্ষণিকের জন্য তার প্রতি অভিমান করেন ঠিকই, কিন্তু চরম রুষ্ট হন না। আর সন্তান যখন মায়ের ভালোবাসার টানে তার দিকে ছুটে আসে, তখন মা তাকে বুকে টেনে নেন। বরং অনেক সময় এর পূর্বেই একান্ত সন্তর্পণে সন্তানের প্রতি তাকান যে, সে কি করছে, আমার কাছে আসছে কি-না। যাহোক, সন্তান যখন মায়ের কাছে আসে তখন মায়ের রাগ দূর হয়ে যায়। অতএব, খোদা তা'লা যিনি মায়ের চেয়েও বেশি ক্ষমাশীল, তিনি এটি দেখেন, কখন আমার বান্দা তওবা করে আমার দিকে ফিরে আসবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব। মহানবী (সা.) বলেছেন, খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা বান্দার তওবায় এতটা আনন্দিত হন যে, ততটা আনন্দিত সেই ব্যক্তিও হয় না, যে মরুভূমিতে তার হারানো উট ফিরে পায়।** (সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব আত্ তওবা, হাদীস নম্বর: ৬৩০৯)

অতএব, **রমযান মাসের উদ্দেশ্য হল, খোদার ভালোবাসা হৃদয়ে লালন করে বান্দা যদি সারা বছরের ভুল-ভ্রান্তি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও তওবা গৃহীত হওয়ার মানসে খোদার কাছে আসে, তাহলে খোদা তা'লা ছুটে এসে তাকে নিজের কোলে টেনে নেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণ আমার নিকটতর হয় আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত আমার নিকটতর হয়, আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে ছুটে যাই।** (সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুত্ তওহীদ, হাদীস নম্বর: ৭৪০৫)

কাজেই এমন খোদা, যিনি মায়ের চেয়েও বেশি স্নেহশীল, যিনি তওবা গ্রহণ এবং বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন বিধান করে রেখেছেন, বান্দা যদি সেগুলোকে কাজে না লাগায়, তাহলে এটি বান্দারই দুর্ভাগ্য এবং তারই পাষণ্ডতা। এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যদিও বান্দার প্রতি খোদার ভালোবাসার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খোদার ভালোবাসা এসব দৃষ্টান্তের বহু উর্ধ্বে। যে স্নেহ এবং ভালোবাসার দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রতি তাকান, তার চিত্র অঙ্কন করার ক্ষমতাই আমরা রাখি না। এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেয়া সত্ত্বেও, এসব দৃষ্টান্ত যদিও ভালোবাসার এক সুমহান চিত্র প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু বান্দার প্রতি খোদার ভালোবাসা তোমাদের এই জাগতিক বিভিন্ন দৃষ্টান্তের বহু উর্ধ্বে, আর সত্যিকার অর্থে একে আয়ত্ত করা খুবই কঠিন। মানুষ অত্যন্ত দুর্বল এবং সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। আর খোদা তা'লা অনেক মহীয়ান ও গরীয়ান। আমরা তো আমাদের মত মানুষের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র জানতেও সক্ষম নই। কারো বাহ্যিক কর্ম বা আমল দেখে আমরা কোন মতামত দিতে পারলেও, কারো হৃদয়ে কারো প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত চিত্র কী, বা তার হৃদয়ে কী আছে, এটি বর্ণনা করা বা এটি অবহিত হওয়া খুবই কঠিন।

খোদার ভালোবাসার অবস্থা অনুধাবন করার যোগ্যতা মানুষের মাঝে কতটা আছে সে বিষয়টি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা, যার কাজ বা কর্ম সম্পর্কে বুঝাও আমাদের জন্য সম্ভব নয়, তাঁর ভালোবাসার স্বরূপ অনুধাবন করা আমাদের জন্য কী করে সম্ভব হতে পারে? যার বাহ্যিক বিষয়গুলোই আমরা বুঝি না, তাঁর ভালোবাসার স্বরূপ আমরা কীভাবে উদঘাটন করতে পারি? তাই যেমনটি আমি বলেছি, একে আয়ত্ত করা সত্যিই খুব কঠিন বিষয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও উদাহরণের মাধ্যমে এর বাস্তবতা বা এর প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। খোদাপ্রেমের বিষয়টি মহানবী (সা.)ও বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। পূর্বে দু'টো দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরেছি।

এই ভালোবাসার আরো একটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি, যা মহানবী (সা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন। বদরের যুদ্ধে শত্রুরা যখন পরাজিত হয়, আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল, কাফিরদের বড় বড় বীর যোদ্ধা নিজেদের বাহনে বসে সেগুলোকে চাবুকাঘাত করে যত দ্রুত সম্ভব রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার এবং মুসলমানদের থেকে দূরে সরে পড়ার চেষ্টা করছিল, তখন রণক্ষেত্রে একজন মহিলা কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই ছুটে বেড়াচ্ছিল। তার ভেতর এক প্রকার আবেগ ও উন্মাদনা কাজ করছিল। কখনো কোন শিশুকে কোলে তুলে নিচ্ছিল, আবার কখনো বা অন্য কোন শিশুকে। সেই মহিলাকে দেখে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের বলেন, এই মহিলার সন্তান হারিয়ে গিয়েছে, আর সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মায়ের ভালোবাসা এতটাই প্রবল যে, তার আদৌ এই চিন্তা নেই যে, সে রণক্ষেত্রে রয়েছে, আর এখানে সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞ বিরাজ করছে। সেই মহিলা উন্মাদের মত ছুটছিল। যে শিশুকেই সে দেখত বুকে টেনে নিত, কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখার পর যখন বুঝতে পারত যে, এটি তার সন্তান নয়, তখন তাকে রেখে সে সামনে এগিয়ে যেত। অবশেষে সে তার সন্তানকে খুঁজে পায়, তাকে বুকে টেনে নেয়, জড়িয়ে ধরে, আদর করে এবং সারা পৃথিবীর প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে তাকে নিয়ে সেখানেই বসে পড়ে। তার এই চিন্তাও ছিল না যে, এটি রণক্ষেত্র। আর এই ভাবনাও ছিল না যে, এখানে সর্বত্র লাশের ছড়াছড়ি। তার মাথায় এই ধারণাও আসে নি যে, এখনো যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হয় নি তাই তারও ক্ষতি হতে পারে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি দেখেছ, এই মহিলা যখন নিজের হারানো সন্তান ফিরে পায়, তখন কত নিশ্চিন্ত মনে সে বসে পড়ে। কিন্তু যখন সে নিজ সন্তানের সন্ধানে ছিল, তখন কীরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ পাচ্ছিল আর সে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটছিল। এরপর তিনি (সা.) বলেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার দৃষ্টান্তও এমনই। বরং তিনি বান্দাদেরকে এর চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। বান্দা যখন স্বীয় পাপ-পঙ্কিলতা আর ভুল-ভ্রান্তির কারণে আল্লাহ্ তা'লাকে হারিয়ে ফেলে, তখন খোদা তা'লা ততটাই দুঃখ পান, যতটা এই মহিলা তার সন্তান হারিয়ে যাওয়ার ফলে পেয়েছে। এরপর বান্দা যখন অনুশোচনার সাথে ফিরে আসে, তখন এই মহিলা তার সন্তানকে খুঁজে পেয়ে যতটা আনন্দিত হয়েছে, তিনি তার চেয়েও অধিক আনন্দিত হন। আমাদের খোদা সর্বদা ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু শর্ত হল, আমরাও যেন প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর ক্ষমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। তিনি দেখছেন, আমরা কখন তাঁর পানে অগ্রসর হই। বিলম্ব কেবল আমাদের পক্ষ থেকেই হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার আমরাই। যে ব্যক্তি খোদার সামনে বিনত হয়, তাঁর কাছে অনুশোচনা এবং তওবার মাধ্যমে ফিরে আসে, তাঁর কাছে পাপের ক্ষমা চায়, খোদা তা'লা তাকে মাগফিরাত বা ক্ষমার চাদরে আবৃত করে নেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় এই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, খোদা তা'লার ক্ষমা মানুষের পাপকে কেবল আবৃতই করে না বরং তার পাপকে ভুলে যায়। আর কেবল নিজেই ভুলে না বরং অন্যদেরও ভুলিয়ে দেয়। সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লার নাম 'সাতের' নয় বরং

'সাত্তার'। 'সাত্তার' সেই সত্তা, যার মাঝে সতর বা আবৃত করার যে বৈশিষ্ট্য আছে তার পুনরাবৃত্তি হয়। বারবার সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অর্থাৎ অতি মাত্রায় সাত্তারি বা ঢেকে রাখার বা আবৃত করার গুণ দেখা যায়। পৃথিবীর মানুষ কেবল 'সাতের' হতে পারে। অর্থাৎ কেউ যদি কারো পাপের খবর রাখে তাহলে হতে পারে যে, সে হয়তোবা বলে বেড়াবে না বা ঢেকে রাখবে। কিন্তু কারো মাথা বা মন-মস্তিষ্ক থেকে কারো পাপের যে জ্ঞান রয়েছে, সেটি বের করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু সকল গুণের আধার বা সমাহার, তাই তিনি তার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, আমি 'সাতের' নই বরং আমি 'সাত্তার'। অর্থাৎ আমি

বান্দার পাপ শুধু ক্ষমাই করি না বরং আমি মানুষের মন-মস্তিষ্ক থেকে পাপের যে স্মৃতি রয়েছে তা মুছে দেই। এমনকি তাদের স্মরণও থাকে না যে, অমুক ব্যক্তি অমুক পাপ করেছিল। যদি খোদা তা'লা 'সাত্তার' না হতেন, তাহলে জানড়বাতেও পাপীদের কোন শান্তি বা নিরাপত্তা থাকত না। সে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তাকিয়ে বলত, এ আমার পাপের সংবাদ জানে।

অতএব, **আল্লাহ্ তা'লা সাত্তার। তিনি বলেন, আমি কেবল মানুষের পাপ ক্ষমাই করি না, বরং মানুষের স্মৃতিশক্তির উপরও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখি। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা যখন সাত্তারী করতে চান বা ঢেকে রাখতে চান, তখন অন্যের পাপের কথা মানুষের মনেই থাকে না। আর আল্লাহ্ তা'লা যার পাপ-পঙ্কিলতা ঢেকে রাখতে চান, তাকে মানুষ সবসময় পুণ্যবান, পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ মনে করে। কাজেই আমাদের খোদা 'সাত্তারুল উয়ূব' এবং 'গাফ্‌ফারুয্ যুনূব' অর্থাৎ তিনি দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন আর পাপ-পঙ্কিলতা ক্ষমা করেন। তিনি শুধু ক্ষমাশীলই নন, বরং আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্মানও পুনর্বহাল করেন, আর এই পৃথিবীতে সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।** (খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৫১৩-৫১৫)

অতএব, আমাদের খোদা যেখানে এত প্রিয়, সেখানে আমাদের কত ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর পানে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন? কতটা তাঁর দাসত্ব করা বা বান্দা হওয়া প্রয়োজন? কাজেই, আশিসমণ্ডিত এই মাসে এই 'সাত্তারুল উয়ূব' এবং 'গাফ্‌ফারুয্ যুনূব' খোদার প্রতি ছুটে যাওয়া প্রয়োজন এবং তাঁর সমীপে সমর্পণ বা বিনত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। প্রতিটি মোড়ে দাঁড়িয়ে শয়তান আমাদেরকে স্বীয় প্রলোভনের ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় রত কিন্তু আমাদেরকে এর মোকাবিলা এবং খোদার আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে শয়তানের প্রতিটি আ মণ থেকে বাঁচতে হবে এবং তাকে ব্যর্থ করতে হবে আর নিজেদেরকে খোদার প্রকৃত বান্দায় পরিণত করতে হবে। তবেই আমরা সত্যিকার অর্থে রমযান থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব। আর যেমনটি আমি বলেছি, এর ফলে যেখানে আমরা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হব, সেখানে সমষ্টিগত বা জামা'তী ফলফলাদিও আমরা লাভ করব। জামা'তের সভ্য এবং সদস্যদের সংশোধন, তাদের নেকী বা পুণ্য এবং খোদা-ভীতিই জামা'তের উন্নতিতে পর্যবসিত হয়। আমরা যত বেশি খোদার নৈকট্য অর্জনকারী হব ততটাই খোদার কৃপাধন্য

হয়ে জামা'তী উনড়বতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হব। আমরা একথাও জানি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **আমার উন্নতি এবং বিজয় হবে দোয়ার মাধ্যমে।** (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৮)

অতএব, জামা'তী উন্নতি যাচনা করে খোদার চরণে আমাদের অনেক বেশি সমর্পিত থাকা উচিত, আর এই দোয়ার দিনগুলোতে এজন্যও অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। আমরা কেবল আমাদের ব্যক্তিসত্তা বা নিকটাত্মীয় পর্যন্তই যেন আমাদের দোয়াকে সীমাবদ্ধ না রাখি, বরং এর গণ্ডিকে অনেক বিস্তৃত করা উচিত। তবেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত হওয়ার সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব সত্যিকার অর্থে পালন করতে সক্ষম হব এবং খোদা তা'লার সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সক্ষম হব, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি করেছেন। এই জামা'তভুক্ত হয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় নি। আমি আহমদী হয়ে গেছি, বয়আত করেছি, এটিই যথেষ্ঠ নয়। বরং আমাদের স্কন্ধে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার প্রতি জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেন আমরা জামা'তের উনড়বতির পথে সহায়ক এবং সাহায্যকারী হতে পারি। আমরা দুর্বল, আমরা অযোগ্য, আমরা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করি, নিজেদের অযোগ্যতার কথাও স্বীকার করি, কিন্তু এ সবকিছু সত্ত্বেও আমরা সেই জাতি, যাদের উপর আল্লাহ্ তা'লা এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আর খোদার কৃপাধন্য হওয়া ছাড়া সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই দোয়ার প্রতি আমাদের সমধিক দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় এ বিষয়টি খুবই চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন বা বুঝিয়েছেন, আমরা যদি সত্যিই দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে থাকি, আর যে দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তা যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে প্রশড়ব দাঁড়ায়, এমন কাজ আমাদের হাতে কীভাবে সাধিত হতে পারে? এক দিকে এই কার্যসিদ্ধি, অর্থাৎ এই কাজ করা অনেক বড় শক্তির দাবি রাখে, পক্ষান্তরে আমরা দুর্বল ও অক্ষম। তাই দু'টো কথার মাঝে একটি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। হয় আমাদের একথা মানতে হবে যে, আমাদের এই দু'টি দাবির মাঝে একটি দাবি ভুল, অর্থাৎ হয় আমাদের দুর্বলতার দাবি ভুল, আমরা ততটা দুর্বল নই অথবা কাজ কঠিন হওয়ার দাবি ভুল। আর এই উভয়টি যদি সঠিক হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের চেষ্টার ঊর্ধ্বেও কোন উপায় নির্ধারণ করেছেন।

এটি খোদার বাণী এবং তাঁরই প্রতিশ্রুতি যে, আমাদের কাঁধে যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, সে কাজ অবশ্যই সাধিত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেই উদ্দেশ্যে এসেছেন, সেই উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন বা করাবেন। ভূপৃষ্ঠে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বিজয় অবধারিত, ইনশাআল্লাহ্। এতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি অর্জন বা লাভের জন্য খোদা তা'লা আমাদেরকে দোয়ার রীতি শিখিয়েছেন, অর্থাৎ দোয়া কর, হে আল্লাহ্! আমাদের হাতে বা আমাদের

প্রচেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে না। আমরা দুর্বল, আমরা অক্ষম, কিন্তু কাজ অনেক বড়, শুধু আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই কাজ সমাধা হতে পারে না। অবশ্য তোমার নির্দেশের অধীনে আমরা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু তুমিও স্বীয় অনুগ্রহে সেই সুপ্ত মাধ্যমগুলো প্রকাশ কর এবং আমাদের সাহায্যে নিয়োজিত কর যা তুমি এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করেছ যেন এই

অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়ে যায়। বাস্তবতাও এটিই, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কেবল বাহ্যিক হাতিয়ার বা মাধ্যম বানিয়েছেন। নতুবা প্রকৃত হাতিয়ার যা পৃথিবীকে জয় করবে, তা ভিনড়ব কোন জিনিস বা অন্য কোন বিষয়। কিন্তু এসব বিজয় লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে অবশ্যই এক গভীর বেদনা থাকা আবশ্যক। আর সেই বেদনা দোয়া হয়ে আমাদের হৃদয় থেকে উদ্ভূত হওয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, আমাদের দৃষ্টান্ত তেমনই, যেভাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের দিন কঙ্কর উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

(সুরা আল্ আনফাল: ১৮) তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ করা, তোমার নিক্ষেপ করা ছিল না, বরং সেটি খোদার কঙ্কর নিক্ষেপ করা ছিল। তোমার নিক্ষিপ্ত কঙ্কর কিছু দূর গিয়ে মাটিতে পড়ে যেত, কিন্তু এটি তুমি নিক্ষেপ কর নি বরং আমরা নিক্ষেপ করেছি। একদিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য তিনি (সা.)-এর হাত সক্রিয় হয়, আর অপর দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা ঝড়োবায়ু প্রবাহিত করেছি আর এ কারণে সেই ঝড়োবায়ু কোটি কোটি, বরং শত কোটি কঙ্কর উঠিয়ে কাফিরদের চোখে নিক্ষেপ করে। যার ফলে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আক্রমণে ব্যর্থ হয়। বস্তুতঃ সেই মুষ্টিভর কঙ্করের পিছনে সত্যিকার শক্তি ছিল খোদা তা'লার কুদরত বা শক্তি। অতএব, আমাদের অবস্থানও বদরের সেই কঙ্করের মতোই, যা মহানবী (সা.) নিজ হাতের মুষ্টিতে নিয়ে কাফিরদের লক্ষ্য করে ছুড়ে মেরেছিলেন। কাফিরদেরকে সেই কঙ্কর অন্ধ করে নি, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিক্ষেপ করেছিলেন, বরং সেই কঙ্কর তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিল, যা আল্লাহ্ তা'লা ঝড়োবায়ুর মাধ্যমে নিক্ষেপ করেছিলেন।

তাই আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে, আমাদের বাইরেও কোন শক্তি আছে, যা এই মহান কাজ করবে, এবং এর সর্বোত্তম ফলাফল প্রকাশ করবে। আর আমাদের স্বীকার করতে হবে, এই সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য অন্য কোন উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে যা ইসলামকে অন্য সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবে। সেই হাতিয়ার এবং সেই অস্ত্র, যার মাধ্যমে ইসলামকে ভূপৃষ্ঠে জয়যুক্ত করা যেতে পারে তা হল, বান্দার সেই দোয়া যা খোদার কৃপারাজিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। আর খোদা তা'লার কৃপায়ই এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, **এর উপরই আমাদের সফলতা নির্ভরশীল।**

অতএব, **দোয়ার এই দিনগুলো, যা খোদা তা'লা আমাদের উপহার দিয়েছেন, এই দিনগুলোতে সবসময় আমাদের এ কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং যথাবিহিত সচেতনতার সাথে এই দোয়া করা উচিত, তিনি যেন অচিরেই ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয়ের বিধান করেন।** চলুন আমরা মহানবী (সা.)-এর মুষ্টির সেই কঙ্কর হয়ে যাই, যার সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কোটি কোটি কঙ্করের ঝড়োবায়ু প্রবাহিত করেছিলেন, আর কাফিরদেরকে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দুর্বলতা দূরীভূত করে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করুন, আর স্বীয় অনুগ্রহে এমন উপকরণ সৃষ্টি করুন যেন আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। আর আমাদের দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি...। ঔদাসীন্যের কারণে খোদা তা'লার প্রতাপ যেন সুপ্ত না থাকে। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি যেন শত্রুকে আনন্দ-উল্লাসের সুযোগ না দেয়। বরং খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহে স্বীয় প্রতাপ এবং সম্মান প্রকাশের জন্য আমাদের দুর্বল হাতে সেই শক্তি সৃষ্টি করুন যা এই কার্যসিদ্ধির জন্য অপরিহার্য। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৫০৯-৫১১)

অতএব, এ দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়া করুন। নিজের জন্যও, পরস্পরের জন্যও, জামা'তের উন্নতির জন্যও, আর শত্রুর ব্যর্থতার জন্যও। খোদা তা'লার প্রতাপ এবং খোদার মহিমা বিকাশের জন্যও দোয়া করুন। এই পৃথিবী খোদা তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, তারা যেন খোদাকে চিনতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং দুর্বলতা ক্ষমা করুন, আর আমাদের মাঝে এমন শক্তি সৃষ্টি করুন, যে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা ইসলামকে পৃথিবীর সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করতে পারব। আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন ইসলামের সত্যিকার সেবকে পরিণত হয়। জাগতিক কামনা-বাসনা যেন আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। আমাদের হৃদয় যেন এই প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকে যে, ধর্মের নামকে সমুনড়বত করার জন্য আমরা আমাদের সকল শক্তি এবং সামর্থ্যকে কাজে লাগাব। খোদা তা'লা আমাদের কর্ম এবং আমাদের সামর্থ্যে এতটা দৃঢ়তা ও শক্তি সঞ্চার করুন যে, শত্রুর শক্তি-সামর্থ্য এবং দৃঢ়তা যেন আমাদের সামনে তুচ্ছ ও হেয় প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা কেবল আমাদের পাপ ক্ষমাই নয়, বরং পাপের প্রতি আমাদের হৃদয়ে এমন ঘৃণা সৃষ্টি করুন, যেন আমরা কখনো খোদার নির্দেশ লঙ্ঘনকারী না হই। আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা আমার নির্দেশ মেনে চল এবং ঈমানকে উৎকর্ষ পর্যায়ে পৌঁছাও। সকল পুণ্য এবং কল্যাণের প্রতি যেন আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাকওয়া যেন আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, আর খোদার ভালোবাসা এবং খোদাপ্রেম যেন আমাদের খোরাক হয়ে যায়। আমাদের প্রতিটি কর্ম এবং আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ যেন খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হয়, আর আমরা যখন তাঁর দরবারে উপস্থিত হই, তখন তিনি যেন আমাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টিনামা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এই রমযান যেন আমাদেরকে সত্যিকার অর্থেই এ সবকিছু অর্জনে ধন্য করে। (আমীন)

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০-১৬ জুলাই, ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ২৮তম সংখ্যা, পৃ. ৫-৮)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

জুমুআর খুতবা

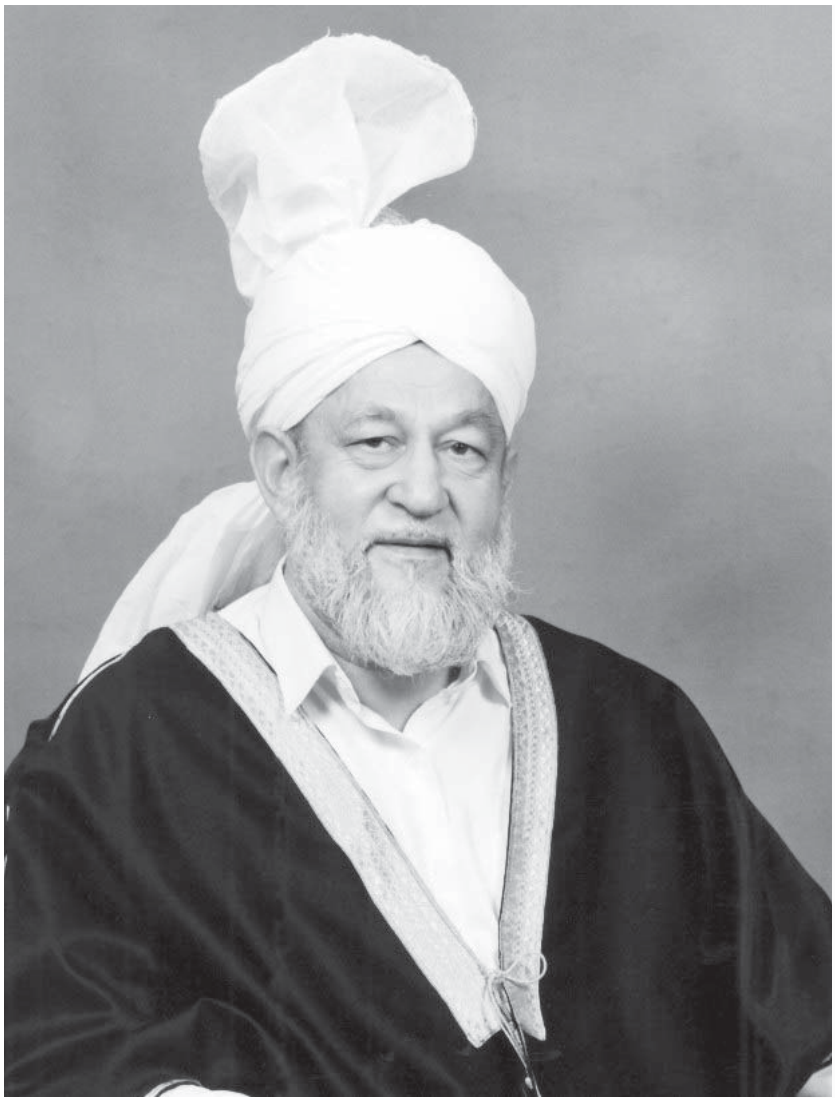

রমযানের শেষ দশক ও দোয়ার মাহাত্ম্য

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক ৮ জানুয়ারী, ১৯৯৯ ইং মসজিদ-ফযল-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

'যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাদের রূহ সিজদাবনত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের দোয়া কবুল হবে না'। 'নিজেদের গৃহের জীবনের জন্য সদাসর্বদা দোয়া করুন যাতে গৃহে আল্লাহ্‌র এ যিক্‌রের দরুন গৃহ (-এর সবাই) জীবিত হয়ে ওঠে।'

তাশাহ্‌হুদ, তাআব্বুয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহে.) সূরা বাকারার ১৮৭ আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝١٨٧

আজ রাত থেকে রমযান মুবারকের আখেরী আশারাহ্ আরম্ভ হচ্ছে। এ দশকটিতে ইতেকাফকারীগণ ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাঁরই ভালবাসায় (আত্মমগ্ন হয়ে) ইতেকাফে বসেন এবং বিশেষভাবে দোয়া করে থাকেন। তবে সর্বাগ্রে আমি সমগ্র জামাতের পক্ষ থেকে দুনিয়া জুড়ে ইতেকাফকারী আহমদীদের কাছে দোয়ার

'যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাদের রূহ সিজদাবনত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের দোয়া কবুল হবে না'। 'নিজেদের গৃহের জীবনের জন্য সদাসর্বদা দোয়া করুন যাতে গৃহে আল্লাহ্‌র এ যিক্‌রের দরুন গৃহ (–এর সবাই) জীবিত হয়ে ওঠে।'

আবেদন জানাচ্ছি যে, ভাইয়েরা! যারা ইতেকাফের বাইরে থাকছি, কিন্তু আত্মিক-সূত্রে তাতে শামিল রয়েছি, তাদেরকেও নিজেদের দোয়ায় যেন স্মরণ রাখেন এবং জামাতের সাধারণ সমস্যাবলীকে সম্মুখে রেখে দোয়া করেন। খোদা করুন, যেন এ ইতেকাফের রাতগুলো কেবল তাদের তকদীরকেই জাগাবার কারণ না হয় বরং জামাতের ও সমগ্র বিশ্বের ইপ্সিত নিয়তিকে জাগাবার কারণ হয়ে যায়। এই ভূমিকার পর আমি ইতেকাফ সম্পর্কিত কিছু বিষয়ও বর্ণনা করবো, যা প্রত্যেক জায়গার মুতাকিফিনদের দৃষ্টিপটে থাকা উচিত। এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণই আঁ-হযরত (সা.)-এর উপদেশাবলীর উদ্ধৃতি-মূলেই বর্ণনা করবো। অতএব, এগুলোর ওপরে বাহ্যিকভাবেও এবং রূহ্ ও অন্তর্নিহিত মর্মের দিক দিয়েও পুরোপুরি আমল হওয়া উচিত।

এখন, এই দিনগুলো খাস কবুলিয়তের দিন, বিশেষভাবে দোয়া করার দিন এবং রমযান-মুবারকের মেরাজস্বরূপ এ শেষ-দশকটি। এর মাঝেই একদিন লাইলাতুল কদর এর রাত্রিও হবে। এ আশারার প্রত্যেক রাতে বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার বিশেষভাবে ঝোঁকার এবং তাদের দোয়া কবুল করার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি, এতে বিশেষতঃ সে বিষয় বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ দোয়ার ওপর সামগ্রিক আলোকপাত সম্বলিত এতোই মহান এ আয়াতটি যে, তা লক্ষ্য করে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। দোয়া এবং ঐশী-নৈকট্যের কোনও দিক তাতে বাদ পড়েনি। এর প্রত্যেকটি দিকে এরূপ আলোকসম্পাত এতে বিদ্যমান যে, মানুষ যদি তাতে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে এরপর দুনিয়ার কোন নাস্তিকের সামনে নত হবার কোনও অবকাশ আর থাকে না।এ বিষয়ে আয়াতটিতে এতই অকাট্য ও চিরস্থায়ী যুক্তি-প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, সার্বিকভাবে এই সব বিষয় একই খুতবায় বর্ণনা করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে এ আয়াতের তফসীর বা ব্যাখ্যায় বিদ্যমান কতক বিষয় আমি বিশদভাবে তুলে ধরবো এবং এরই বিষয় বস্তুকে ঘিরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বহু উদ্ধৃতির মধ্যে কয়েকটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। যদি সময় না বাঁচে, তাহলে আগামী খুতবায়ও এ বিষয়টিই অব্যাহত থাকবে।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে "ইযা সাআলাকা ইবাদী আন্নী ফাইন্নী ক্বরীব"-মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে, "ফাইন্নী ক্বারীব" তখন (বল) নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে রয়েছি। 'ক্বরীব' (নিকটে) এর বহুবিধ অর্থ বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু একটি অর্থ যা আমি মনে করি সম্পূর্ণ সঠিকও সত্য এবং আয়াতের পূর্বাপর বিষয়ের সাথে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ –এতে কোন রায়ের এতটুকুও আমল বা দখল নেই, বরং এ আয়াত এমনটি-ই বলছে। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নৈকট্য বুঝায়। তাঁর নৈকট্যের দরুন খোদা নিকটে।

অতএব, যে-বান্দারা খোদা সম্পর্কে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কি আঁ-হযরত (সা.)-কে অবলোকন করছে না যে, তাঁর মাঝে খোদা কথা বলেন! সুতরাং এ দিক দিয়ে এ একটি মহান আয়াত!! তারা তোমার নিকট প্রশ্ন করে যে, খোদা কোথায়? তাদেরকে দেখিয়ে দাও, তুমিই সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে খোদা বিদ্যমান, তোমার মাঝে খোদা স্ববাক। আর এর প্রমাণ আয়াতটির পরবর্তী অংশে পেশ করা হচ্ছে। "উজীবু দা'ওয়াতাদ্ দায়ি ইযা দাআনি"- প্রথম-প্রমাণ হলো এই যে, তোমার দোয়া গৃহীত হয়নি– এমন কি কখনও হয়েছে? আল্লাহ্ রদ করেছেন এমন কোন দোয়া তোমার আছে কি? অতএব, তুমি (সা.) প্রমাণস্বরূপ খোদাতাআলার অস্তিত্বের এবং এ বিষয়ের যে, যে-দোয়া তুমি কর এবং যে ধারায় তুমি দোয়া করে থাক, ঐ দোয়াসমূহ অবধারিতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই উজীবু দা'ওয়াতাদ দায়ি ইযা দায়ানি'-এ আয়াত থেকে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, যেন-তেন প্রত্যেকের দোয়া বুঝায় এবং যেন-তেন বলতে পারে সে অনেক দোয়া করা সত্ত্বেও তার দোয়া তো কবুল হয়নি– এখানে এর প্রকৃষ্ট অপনোদন রয়েছে। কেননা, 'দায়ী' (প্রার্থনাকারী) বলতে এখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে বুঝায় আর আমার মতে এর প্রথম ও প্রধান অর্থ এটাই। অর্থাৎ 'এই প্রার্থনাকারী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র দোয়া আমি শ্রবণ করি। যখন সে আমাকে ডাকে, আমি তার পাশে থাকি।' এরপর সন্দেহের আর কী অবকাশ থেকে যায়? বস্তুতঃ সমস্ত দুনিয়ার জন্যে খোদাতাআলার অস্তিত্বের এটা এক অকাট্য-অখন্ডনীয় প্রমাণ।

আঁ-হযরত (সা.)-এর তো কেয়ামত অবধি সর্বকালের জন্যে সকল দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন এবং তাঁর ঐ সকল দোয়ারই ফল যে, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহক্রমে ইসলাম দৈনন্দিন নিত্য-নূতন সফলতা লাভে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক যুগেই আঁ-হযরত (সা.)-এর দোয়াসমূহ, এর সাক্ষী যে, আল্লাহ্ বিদ্যমান এবং তিনি সবার চেয়ে বেশী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র খোদা।

অতএব খোদাকে যে দেখতে চায়, সে কাছে থেকে দেখে নিক, মুহাম্মদ (সা.) তার জন্যে খোদা পরিদৃষ্ট হবেন। একথাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, আঁ-হযরত (সা.)-এর সত্তায় আমরা আল্লাজাল্লা শানহুকে আলোকসম্পাত রত (অবস্থায়) দেখতে পাই। তাঁর আলোকসম্পাতের জন্যে অন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই। স্বয়ং

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তা প্রমাণ করছে যে, খোদা তা'লা তাঁর (সা.)সত্তায় জ্যোতির্বিকাশ করছেন। অতএব, 'উজীবু দাওয়াতাদ দায়ি ইযা দায়ানী'-মুহাম্মদ রসূলূল্লাহ্ যখনই আমাকে ডাকেন তখন তাকে কখনও আমি নিরাশ করি নি।

"ফাল্ ইয়াস্তাজীবূলী"-মানুষের জন্যে আদেশ এই যে, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় যেভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাড়া দিয়েছেন। তাহলে তাদের সাথেও তদ্রূপ ব্যবহারই করবো। "ওয়াল ইউমিনূবী-এর প্রকৃত মর্ম অত্র পূর্বাপর সূত্রে এই দাঁড়ায় যে, তারা যেন তদ্রূপ ঈমান আনে, যেরূপ ঈমান এনেছিলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। কেবল দূরে বসে ঈমানের দাবি উচ্চারণ করা তো সম্পূর্ণই বৃথা। প্রকৃত ঈমান হচ্ছে তা, যা ইস্তেজাবত (-আল্লাহ্‌র সমস্ত ডাকে সাড়া দান)এর পরবর্তী ঈমান হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র সব কথা গ্রহণ করো, তারপরেই ঈমানের কথা বলো। আল্লাহ্‌র আদেশ গ্রহণ পালন ব্যতিরেকে কি করে ঈমানের কথা বলতে পার? আর যে আল্লাহ্‌র কথা গ্রহণ করে না, সে আল্লাহ্‌র নিকটেও নয়। আর যে আল্লাহ্ থেকে দুরে থাকে, আল্লাহ্ কী করে তার নিকটে হতে পারেন?

অতএব, আয়াতটিতে এক অদ্ভূত ও বিস্ময়কর বাক-ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নৈকট্যের দোয়াতো আমি অবশ্য শ্রবণ করে থাকি তবে তোমরাও তো আমার নিকটে থাকো; তোমরা তো দূরে বসে আছো - নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছো; অতএব, আমিও দূরে আছি। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর এই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একই সময়ে সবচে' নিকটে, আবার সবচে' দূরে। এতো দূরে যে, কল্পনাও তা নাগাল পায় না। কাজেই তোমরা দোয়া কবুলের কথা তো বল, কিন্তু নিজেরা দূরে সরে থাক। অর্থাৎ প্রকারান্তরে আল্লাহ্ (এ আয়াতটিতে) বলছেন, আমার কথায় যখন তোমরা সাড়া দাও না, তখন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তোমরা অনেক দূরে সরে বসে আছ, বধির হয়ে গিয়েছ-বুঝতে পারছনা যে, আমি তোমাদেরকে কি বলছি। আর (এমতাবস্থায়) যখন তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর, তখন মনে কর আমি যেন তোমাদের নিকটে এসে পড়ি। তা হতে পারে না। ঐ সুন্নতই অনুসরণীয়, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আচরিত সুন্নত। আল্লাহ্ তা'লা এক মুহূর্তও তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যান নি। [কেননা, তিনি (সা.) সবসময় আল্লাহ্‌র প্রত্যেক কথায় সাড়া দেওয়ায় নিজে তাঁর কাছে থেকেছেন]। আর একারণেই প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহ্ তাঁর দোয়া শুনতেন।

"লায়াল্লাহুম ইয়ারশুদূন"-যদি তোমারা 'হেদায়াত' (সঠিক পথ ও সফলতা) লাভ করতে চাও, তাহলে এর জন্যে এটাই নির্ধারিত পন্থা। এখন রমযানের যে বিশেষ রাতগুলো আসছে, এগুলোতে উক্ত পন্থায় পরিচালিত হতে হবে। যদি তদ্রূপ কর, আল্লাহ্ নির্দেশিত ঐ পন্থায় সাধানা কর, তাহলে "লাআল্লাহুম ইয়ারশুদূন"– আল্লাহ্‌র এই ওয়াদা অনুযায়ী তাঁরই অনুগ্রহক্রমে তোমরা সবাই হেদায়াত লাভের সৌভাগ্যে ভূষিত হবে।

এই হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য কিভাবে ঘটবে? এই ঐশী-ওয়াদা কীভাবে পুর্ণ হবে? এ প্রসঙ্গে কিছু কথা এখনই আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। তবে পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী সর্বাগ্রে আমি আঁ-হযরত (সা.)এর আখেরী আশারাহ্ সম্পর্কিত কিছু হাদীস পেশ করছি, যার মাঝে এসব বিষয়ের উত্তর এসে যায়-'লায়াল্লাহুম ইয়ারশুদূন' দ্বারা কী কী বিষয় বুঝায়? কীরূপে তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পার? এই দশ রাত্রের দ্বারা কীভাবে উপকার লাভ করতে পার? এতদ্‌সংক্রান্ত সকল পথ ও পন্থা আঁ-হযরত (সা.)-এর পবিত্র সুন্নত ও উক্তি থেকে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয়।

> এই দিনগুলো খাস কবুলিয়তের দিন, বিশেষভাবে দোয়া করার দিন এবং রমযান–মুবারকের মেরাজস্বররূপ এ শেষ দশকটি। এর মাঝেই একদিন লাইলাতুল কদর এর রাত্রিও হবে। এ আশারার প্রত্যেক রাতে বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার বিশেষভাবে ঝোঁকার এবং তাদের দোয়া কবুল করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে হযরত নবী করীম (সা.) বলেন, "সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রমযানের শেষ-দশকের চেয়ে মহৎ ও প্রিয় আর কোন দিন নেই।" অর্থাৎ এই দশকে আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্যদেরকে মাহাত্ম দান করেন। নইলে, কোন দিন বা রাত আল্লাহ্‌র কাছে কী করে মহান হতে পারে? মহান এ দিক দিয়েই যে, এই দশকে আল্লাহ্‌র সংস্পর্শে যারা আসে, তাদেরকে এটা মহানে পরিণত করে। মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক যতো নিবিড় হবে, যতো বৃদ্ধি পাবে, বান্দাও ততো মহানে পরিণত হতে থাকবে। এতদুদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই দশকে বহুল মাত্রায় 'তাহলীল', 'তাকবীর' ও 'তাহ্‌মীদ' করতে উপদেশ দান করেন। তাহলীল মানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ-আল্লাহ্‌র তওহীদের স্বীকৃতি সম্বলিত যিকর, তাকবীর মানে 'আল্লাহু আকবার', অর্থাৎ-আল্লাহর সর্বব্যাপী মাহাত্মের স্বীকৃতি সম্বলিত যিক্‌র এবং তাহ্‌মীদ মানে 'আলহামদুলিল্লাহ্' আল্লাহ্‌র সার্বিক প্রশংসার স্বীকৃতি সম্বলিত যিক্‌র রাত-দিন অধিক মাত্রায় আবৃত্তি করতে উপদেশ দান করেন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উঠতে বসতে, শুয়ে জেগে, মুখে-অন্তরে আবৃত্তি করতে থাকা উচিত, হৃদয় যাতে স্পন্দিত হয় এবং মানুষ উপলব্ধি করে যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এ সত্যটি খাঁটি অন্তরে যখন সে অনুভব করে, তখন তকবীর আপনা-আপনি তা থেকে ফুটে ওঠে-'আল্লাহু আকবার'-

'আল্লাহ্‌ই সবচে' বড়। তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং সবচে' বড়-এই দুটো কথার মাঝে তো আপাতঃ যেন স্ববিরোধও প্রতীয়মান হয়। যখন এক অদ্বিতীয় , তখন সবচে' বড় এর অর্থ কী? অর্থ, একমাত্র তিনিই, সমস্ত বড়াই ও মাহাত্ম তাঁরই। অবশিষ্ট অন্য সব জিনিস তো কোনও মূল্যই রাখে না, বরং তা চোখের বিভ্রমস্বরূপ, যা দুনিয়াতে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। একমাত্র আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতারই শীর্ষ-মর্যাদা সব কিছুতে উদ্ভাসিত হতে পরিলক্ষিত হয়। তবেই কি-না তওহীদের সঠিক সত্যিকার জ্ঞান লাভ হতে পারে। যদি কারও কাছে তদ্রুপ উদ্ভাসিত না হয়, তবে চোখের বিভ্রম বৈ এসব আর কিছু নয়। অতএব, 'আকবর' একমাত্র সেই খোদা, যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের মালিক। তাহ্‌লীল দ্বারা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠতা আপনাদের উপর সমুজ্জ্বল হবে। আর যারা তাঁর একনিষ্ঠ-বান্দায় পরিণত হন, যিনি সবচে' মহান, সেই আল্লাহ্‌ তা'লার পক্ষ থেকে তাদেরকে অবধারিতভাবে সেই মাহাত্ম্য ও মহানত্ব লাভের সৌভাগ্য দান করা হয়, যা খোদার গোলামদেরকেই দান করা হয়ে থাকে-যে মহানত্ব আঁ-হযরত (সা.)-কে সবচে' বেশি দান করা হয়েছে।

উক্ত দু'টো বিষয়ের দরুন হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্তরূপে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। মানুষ যখন খোদা তা'লার তওহীদকে প্রত্যক্ষ্যভাবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বীকার করে এবং এর ফলশ্রুতিতে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মহত্ব তার ভাগ্যে ঘটে, যা কেবল তাঁর একনিষ্ঠ দাসগণই পেয়ে থাকেন, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বা তাদের অন্তর থেকে 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' প্রস্ফুটিত হয়। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে"-এ বাক্যে দু'টি দিক নিহিত আছে। এক, নিজের সত্তার দিকে যেন বান্দার দৃষ্টি না যায়-এই খেয়াল যেন না হয় যে, আহা! আমিও বড় কিছু হয়ে গেলাম। তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিকার হবে 'আলহামদ'-এর দ্বারা। অর্থাৎ- প্রশংসারাজী তো কেবল আল্লাহ্‌রই। আমরা তাঁর কিছু খয়রাতস্বরূপ পেয়েছি; আমাদের তো মূলতঃ কিছুই নয়।' দ্বিতীয়তঃ 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' গভীর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন-সূচক কলেমা বা প্রবচনে পরিণত হয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-এর সময় থেকে চলে আসছে যে, যখন ভাল কোন সংবাদ পাওয়া যায় তখন মুখ থেকে অবলীলায় 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' নিঃসৃত হয়। কাজেই, উল্লেখিত উভয় অর্থে 'আলহামদু লিল্লাহ্‌'র আবৃত্তি এ দিনগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

আরেকটি হাদীস 'সহী মুসলিম, কিতাবুল ই'তিকাফ' থেকে গৃহীত। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রমযানের শেষ দশকে আঁ- হযরত (সা.) অত্যধিক মুজাহাদা (সাধনা) করতেন এতো যে, ঐ দিনগুলো ব্যতীত অন্যান্য দিনে ততো মুজাহাদা করতেন না। অতএব, এর প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী আহমদীদের উদ্দেশ্যে আমার নসীহত হলো, গাফিলতি যদি আগে হয়ে থাকে, তা পরিহার করুন এবং এখন এই দশকের মুজাহাদায় আত্মনিয়োগের জন্যে নিজেরা তৈরী হয়ে নিন।

মুসলিম, কিতাবুয যিকর্‌-এ আবু মূসা (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি রয়েছে যে, (একদল সাহাবাসহ) আঁ-হযরত (সা.) কোন এক সফরে ছিলেন, তখন মানুষ জোরে জোরে তকবীর-ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকলেন। তাতে হুযূর পাক (সা.) বললেন, হে জনগণ! মধ্যবর্তী-পন্থা অবলম্বন কর, তোমরা তো কোন বধিরকে আহ্বান করছো না এবং এমন কাউকেও না, যিনি নিকটে উপস্থিত নন। তোমারা বস্তুতঃ আহ্বান করছো তাঁকে, যিনি 'সামী' (সর্বশ্রোতা) এবং তাঁকে, যিনি হচ্ছেন ক্বারীব' (নিকটে উপস্থিত)।" এখন এই উপদেশটি থেকে আমরা ঐশী-নৈকট্যের অর্থও জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্‌ তা'লা আঁ-হযরত (সা.)-এর পাশাপাশি, তাঁর সাহাবাদেরও নিকটে ছিলেন। অনেক বড় ধরনের সুসংবাদ এটা সাহাবাদের জন্যে। তাঁরা তাঁকে ডাকছেন, যিনি হচ্ছেন তাদের নিকটে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ও ছিলেন নিকটে, যাঁর মাঝে আল্লাহ্‌ ছিলেন বিরাজিত। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর মাধ্যমে, তাঁর কল্যাণ প্রসাদে সাহাবাগণও ছিলেন খোদার নিকটে এবং তাদের মধ্যেও খোদা আলোকসম্পাত করেছিলেন। অতএব, আল্লাহ্‌ যেহেতু সর্বশ্রোতা এবং ক্বরীব (নিকটে উপস্থিত), সেহেতু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ডাকো। উঁচু আওয়াজে তাঁকে ডাকা জরুরী নয়। কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ (সা.) তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু খোদাকে শোনাবার জন্যে নয়, বরং এরূপ মানুষদেরকে শোনাবার জন্যে, যাদের ওপর তকবীরের প্রতাপ ও প্রভাব আরোপ করা আবশ্যকীয় ছিল। অতএব, ঐরূপ ক্ষেত্রে তকবীর-ধ্বনি সজোরে উচ্চারিত হয় তাদেরকে শোনাবার উদ্দেশ্যে, যারা হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের প্রতি বধির-স্বরূপ, যাতে তকবীরের ছোঁয়া তাদের হৃদয়ে লাগলে তাদের সুপ্ত হৃদয় জেগে ওঠে। হয়ত এর কষাঘাতে আল্লাহ্‌ তা'লার যিক্‌র তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

'বুখারী, কিতাবুস সওম'-এ, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে, যখন রমযান শেষ দশকে প্রবেশ করতো বা শেষ দশক শুরু হতো, তখন আঁ-হযরত (সা.) কোমর বেঁধে তাতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাঁর রাতগুলোকে জীবিত করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকেও ইবাদতের জন্যে জাগাতেন।" পরিবার-পরিজনকে জাগানো তো তাঁর সব সময়ের সাধারণ-রীতি ছিল এবং তাঁর রাত্রিগুলোও (ইবাদতে) জীবিত-ই থাকতো। এই হাদীস থেকে অধিকতর চেষ্টা-প্রয়াস এবং অধিকতর মনোনিবেশ প্রমাণিত হয়। অতএব, যারা আগে থেকে তাহাজ্জুদগুজার রয়েছেন, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই দশ রাতের তাহাজ্জুদের মধ্যে নুতন কোন বৈশিষ্টের সৃষ্টি হওয়া উচিত, যা তাদের পূর্বে আদায়কৃত তাহাজ্জুদে ছিল না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাহাজ্জুদ নামাযে যাবতীয় এ রকম বৈশিষ্ট্যই ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) ঐ রাতগুলোতে বিশেষ সাধনা করতেন এবং এ কারণে খোদা তা'লার এই ওয়াদা যে, 'ইন্নি ক্বরীব' তা হচ্ছে নিকটে হওয়া সত্ত্বেও আরও নিকটে হবার ওয়াদা। এর কী অর্থ? এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনন্ত-অসীম। এই ধারণা মন থেকে বের করে দেয়া উচিত যে, 'আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে হয়ে গিয়েছি, এ-ই যথেষ্ট হয়েছে।' রসূলুল্লাহ (সা.)-ও আল্লাহ্‌র এরূপ নিকট হননি যে, এর পরে আরও নিকটে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। সেরূপ যদি হতো, তাহলে আঁ-হযরত (সা.)-ও স্থবির এবং খোদাও স্থবির হয়ে যেতেন। অথচ যে খোদা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর আলোক-সম্পাত করেছেন, সে-খোদা কখনও স্থবির নন, একই জায়গায় তিনি থেমে নন। নৈকট্যেও তিনি অগ্রসর হয়ে থাকেন। আর মানুষ যখন ভাবে যে, এর চে' বেশি নৈকট্য কি সম্ভব নয় তখন সে আরও নৈকট্যের দৃশ্য অবলোকন করে থাকে। বস্তুতঃ আঁ- হযরত (সা.) এহেন

আঁ-হযরত (সা.)-এর তো কেয়ামত অবধি সর্বকালের জন্যে সকল দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন এবং তাঁর ঐ সকল দোয়ারই ফল যে, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহক্রমে ইসলাম দৈনন্দিন নিত্য নূতন সফলতা লাভে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক যুগেই আঁ-হযরত (সা.)-এর দোয়াসমূহ, এর সাক্ষী যে আল্লাহ্ বিদ্যমান এবং তিনি সবার চেয়ে বেশী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র খোদা।

নৈকট্যে সদা অগ্রসরমান থাকেন। কেউ বলতে পারেনা যে, নৈকট্যে কোনও মার্গে পৌঁছার পর তিনি সেখানে থেমে গিয়েছিলেন। অতএব, সেজন্যেই আল্লাহ্ তা'লা আঁ-হযরত (সা.)-কে অধিকতর নৈকট্যের ওয়াদা দিতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট অন্যান্য যতো তাহাজ্জুদগুজার ও খোদার পথের সন্ধানী যারা রয়েছেন, তাদের জন্যে এ বিষয়টিতে বড় ধরনের উপদেশ নিহিত রয়েছে, তারা যেন ঐশী নৈকট্য সন্ধানে আরও সচেষ্ট হন।

কোনও এক পর্যায়ের নৈকট্যের কথা ভেবে সেখানে থেমে যাওয়া যথেষ্ট নয়। এটা পার্থিব প্রেমিকদের কাজ যে, তারা পরস্পর ঘনিষ্ট হতে হতে কোন এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়। আর যেখানে থেমে যায় সেখান থেকেই তাদের প্রেম মরতে শুরু করে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র প্রেম চিরস্থায়ী, এবং তাঁর নৈকট্যের পথে এমন কোন মার্গ নেই যেখানে আপনারা থেমে যাবেন আর তখনই প্রেম ম্রিয়মাণ হতে শুরু করবে। সুতরাং এই সব বিষয়-বস্তু আঁ-হযরত (সা.)-এর এ সুন্নতটির অন্তর্ভূক্ত যে, (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পথে) তিনি তাঁর কোমর বেঁধে আত্ম-নিয়োজিত হতেন, যেভাবে পরিশ্রমের কাজের জন্যে কেউ তাঁর কোমর-বন্ধকষে বেঁধে নেয়। এটাকেই আরবী ভাষার বাগধারায় কোমর বেঁধে নেওয়া বলা হয়। অতএব, আঁ-হযরত (সা.)-ও ওরূপই কষে কোমর বেঁধে নিতেন। (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সদা অধিকতর অগ্রসরমান হবার উদ্দেশ্যে)।

তাঁর ইতেকাফে বসার যদ্দুর সম্পর্ক, সে-প্রসঙ্গে হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি আমাদের পথ-প্রদর্শন করছে। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল থেকে গৃহীত, রমযানের শেষ দশকে রসূলুল্লাহ (সা.) ইতেকাফ করেন। তাঁর জন্য খেজুরের শুকনো ডাল-পাতা দিয়ে হুজরা (কক্ষ) নির্মাণ করা হয়। স্মরণ রাখবেন যে, ঐ যুগে মসজিদ-নববী আয়তনের দিক দিয়ে এতো বড় বিস্তৃত ছিল যে, বর্তমানকালের মসজিদগুলোতে আপনারা তা ভাবতেও পারেন না। অনেক বিশাল ব্যাপক মসজিদ-নববী। সেখানে জায়গায় জায়গায় পৃথক তাবু স্থাপন করা হতো। আলাদা আলাদা হুজরা তৈরী করা হতো এবং সাধারণতঃ একজনের আওয়াজ আরেকজনের নির্জনতায় ব্যাঘাত ঘটাবার কারণ হতো না। এ-ই ছিল চলমান রীতি।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন তিনি (সা.) কক্ষের বাইরে উকি দিয়ে বললেন, এখন সকল ই'তেকাফকারী মনোযোগ দিয়ে শুনে নিন। তিনি বললেন, নামাযী তার প্রতিপালক প্রভুর কাছে আকুতি-মিনতি এবং প্রেম নিবেদনে আত্ম-মগ্ন হয়ে থাকে, সেজন্যে একে অন্যকে শোনাবার উদ্দেশ্যে 'কিরায়াত বিল জাহ্‌র, (উঁচু কণ্ঠে তিলাওয়াত) করো না। হাদীসটির ভাষ্য হচ্ছে "লা ইয়াহ্‌জার বা'যুকুম আলা বা'যিন বিল কিরায়াতি" অর্থাৎ- এর দু'টো অর্থ করা যেতে পারে- 'নিজের কিরায়াতের দ্বারা আরেকজনের কিরায়াতে যেন ব্যাঘাত না ঘটায়'। আরেকটি প্রচলিত অর্থ হচ্ছে 'কাউকে শোনাবার উদ্দেশ্যে'। তবে সাধারণতঃ ই'তেকাফে বসার যে রীতি রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কখনও শুনিনি যে, কেউ তার কোন হুজরায় বসে অন্য কাউকে শোনাবার জন্যে কুরআন পাঠ করে। এ তো কোন কুরআন ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। কিন্তু অপরদিকটি-ই সঠিক যে, যদি কেউ উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করে, তাহলে সে অন্যের তিলাওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে। আর এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে একাগ্রচিত্তে নিবিড়-সম্পর্ক গড়ে তোলার রাত। তাতে কারো এই অধিকার নেই যে, কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারাই হোক না কেন, নিবিড়-চিত্ততার এই নির্জন মুহূর্তগুলোতে তা কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে তাঁর তাঁবু থেকে বের হয়ে এ কথাটি বললেন, তাতে দুটি বিষয় সুনিশ্চিত। এক, আঁ- হযরত (সা.)-এর কিরয়াতের আওয়াজ অন্যান্য তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছাত না, যদি পৌঁছত, তাহলে ঐ নসিহত তিনি করতেই পারতেন না। কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর চেয়ে বেশি ভালবাসা আর কার-ই বা থাকতে পারে? তাঁর তিলাওয়াতের আওয়াজ তো তাঁর আওতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর অন্য কোনও তাঁবুর আওতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না, কিন্তু অন্যদের আওয়াজ এসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে-তা তখনই সম্ভব যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তাঁবু পর্যন্ত আওয়াজ এসে পৌঁছতো। সুতরাং তিনি তা শ্রবণ করেন এবং অপসন্দ করেন এবং অন্যান্যদের জন্যেও এই সূত্রে এক রকম নিরাপত্তার বিধান করেন যে, প্রত্যেকের ন্যায্য-অধিকার রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে নির্জন, নিবিড়-চিত্ততার ব্যাপারে সে যেন পৃথক এবং গোপন থাকে। অন্য কেউ যেন তার ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ না হয়। উল্লেখিত বিষয়টি যেন আমাদের এ'তেকাফকারীরা দৃষ্টিপটে রাখেন। অনেক সময় এরূপ হয়ে থাকে যে, তাঁরা তাদের ইবাদত করার সময়ে, কান্নাকাটির সময়ে অথবা তিলাওয়াত

করার সময়ে এসব কথা ভুলে যান, আর এর ফলে সব সময় আপত্তির সৃষ্টি হতে থাকে।

এখন, একটি হাদীস 'আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত' থেকে নেয়া হয়েছে। হযরত ফাযালা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, আঁ-হযরত (সা.) এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে শ্রবণ করলেন, সে আল্লাহ্ তা'লার হাম্‌দ ও সানা করেনি এবং নবী করীম (সা.)-এর প্রতি দুরূদও পাঠায় নি। অতএব, যারা তাদের দোয়াসমূহকে মকবুল (গ্রহণযোগ্য) করে তুলতে চান, তাঁরা এই নসীহতটি মনোযোগ সহকারে শুনে নিন যে, রমযানের দোয়াসমূহ গৃহীততো হবে, কিন্তু আগে তসবীহ্, তাহ্‌মীদ ও দুরূদ পাঠ করা আবশ্যকীয়। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, সে তাড়াহুড়া করেছে, অর্থাৎ- ত্বরিৎ সে তার ঈপ্সিত কথায় চলে এসেছে এবং ভুলে গেছে যে, যে পথ ধরে তার স্বার্থের কথা বলা উচিত ছিল, যার দরুন সে সফলকাম হতে পারতো, তা সে অবলম্বন করতে বিস্মৃত হয়েছে। সে সংক্ষিপ্ত করে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার চেষ্টা করেছে। সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে মানুষ কোন সময় আবার পদস্খলিত হয়ে থাকে এবং উদ্দেশ্য হাসিলেই ব্যর্থ হয়। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা ধারা ও কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারিত আছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, নিজেদের দোয়াকে তোমরা যদি কবূল করাতে চাও, তাহলে এই পদ্ধতি অবলম্বন কর। সে পদ্ধতিটি কী? রসূলুল্লাহ্ তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা সে ব্যতীত অন্য কাউকে বললেন, যে-ও শ্রবণ করছিল, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দোয়া চায়, তখন সে যেন তার প্রভু আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা করে। এতদ্ব্যতীত কখনও যেন সে দোয়া না চায়। তারপর নবী করীম (সা.)-এর ওপর যেন দুরূদ পাঠায়।" হাদীসটির ভাষ্য হচ্ছে- "সুম্মা ইউসাল্লি আলান নাবীয়ে" আর সেই সঙ্গে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"-ও বলেন। এখানে নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে পৃথক করে আমাদের উদ্দেশ্যে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম" শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করেন। আসল রিওয়ায়াতে হুবহু ওরূপেই লিপিবদ্ধ আছে। তারপর বলেন "সুম্মা ইয়াদউ বা'দু মা শা'য়া-এর পর যা ইচ্ছা দোয়া করুক। "যো দোয়া কিজিয়ে কবুল হ্যয় আজ" ধরনের ব্যাপারে হবে। তখন যে দোয়াই করা হোক তা গ্রহণযোগ্য দোয়া হবে।

আঁ-হযরত (সা.) দোয়ার কবুলিয়ত সম্পর্কিত বিশেষ একটি মওকার কথা উল্লেখ করেছেন, যখন দোয়া বেশি কবুল হয়ে থাকে। সে মওকাটি! কী তা হচ্ছে, সিজদার অবস্থা। 'মুসলিম কিতাবুস সালাতে' হাদীসে এটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত (সা.) বলেন, মানুষ তখন তার প্রতিপালক প্রভুর সবচে' নিকটে হয়, যখন সে সিজদায় থাকে। সেজন্যে তখন অনেক দোয়া করো। (মুসলিম কিতাবুস সালাত বাবু মা ইয়াকুলু ফিররুকূয়ে ওয়াস সাজুদ)

এখন, আপাতদৃষ্টে হাদীসটির সাথে অন্য কোন কোন হাদীসের এক বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। হযরত আয়েশা ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন এবং সাহাবাগণ বর্ণিত কতিপয় রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায় সারা রাত খোদার সমীপে দন্ডায়মান অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন, এমন কি তাঁর পা ফুলে যেতো। এখন, সিজদার অবস্থা এবং কিয়াম বা দন্ডায়মান অবস্থার মাঝে এ প্রসঙ্গে পার্থক্য কী? এ বিষয়ে তা আমি বোঝাতে চাই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রকৃতপক্ষে তখনও সিজদার অবস্থাতেই থাকতেন। আসল সিজদা হচ্ছে রূহের সিজদা। বাহ্যিক-সিজদাও ঐশী নৈকট্যের এক প্রতীকি চিহ্নস্বরূপ হয়ে যায়। তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিজদাগুলো সুদীর্ঘ হবারও উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বেশির ভাগ বর্ণনায় রাত্রিকালে সুদীর্ঘ কিয়ামের উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যায়।

অতএব, এই ধারণা গ্রহণ করা যে, সিজদা একটি পৃথক অবস্থা ছিল এবং কিয়াম ভিন্ন এক অবস্থা ছিল, তা এজন্যে সঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আত্মা বা রূহ কখনও সিজদা থেকে পৃথক হয়নি। সুতরাং তাঁর রূহ্ সিজদাবনত থাকতো, যদিও কি-না দেহ দন্ডায়মানই হতো। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সিজদার অবস্থায় আল্লাহ্ নিকটতর হযে থাকেন। অতএব, আল্লাহ্ তাঁর (সা.) অধিকতর নিকটে ছিলেন, যদিও বা নামাযে তিনি দন্ডায়মান অবস্থায় থাকুন অথবা বাহ্যিকভাবে সিজদারতই হোন। অতএব, এ বিষয়টি স্মরণ রাখবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের রূহ সিজদাবনত না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের দোয়াসমূহ কবুল হবে না। দোয়া কবুল হবার আরেকটি পদ্ধতি, যা আঁ-হযরত (সা.) বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে– বর্তমান দিনকালের আগেই বর্তমান দিনকালের প্রস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আজ আমরা চাই যেন আমাদের দোয়া কবুল হয়। আর তেমনি বিপদ-মসিবতের সময়ও আমরা চাই আমাদের দোয়া যেন কবুল হয়। আঁ-হযরত (সা.) বলেন, "যখন স্বচ্ছলতার দিন থাকে যখন তোমাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন বা অভাব অনটন থাকে না, তখন আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হও এবং মুনাজাত করো। তাহলে এরূপ কখনও হতে পারে না যে, তোমাদের প্রয়োজনের সময়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভুলে যান।" অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিনগুলো (রমযানের শেষ দশক) বিশেষ কবুলিয়তের দিন-স্বরূপ এবং ঐশী-নৈকট্যের দিন-স্বরূপ এজন্যে ছিল যে, তাঁর সাধারণ দিনকালও তদ্রুপই ছিল। কখনও তাঁর ওপর এরূপ কোন অবকাশের দিন আসেনি, যখন তিনি কি-না আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অমনোযোগী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ প্রয়োজন পড়ার আগেই প্রয়োজনগুলোর জন্যে তিনি দোয়া করে থাকতেন। আর সুন্নতটি তাঁর এতোই সুমহান যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্যে কিয়ামতকাল অবধি সম্ভাব্য যা কিছু প্রয়োজন আসন্ন ছিল, কল্পনার চোখে সেগুলোর বিবেচনা করেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) তজ্জন্য দোয়া করে নেন।

কাজেই সেই খোদা তাঁর দোয়াসমূহ কী করে অগ্রাহ্য করতে পারেন, যখন কি-না তিনি সেগুলোর কোনও প্রয়োজন পড়ার বা দেখা দেয়ার আগেই সেগুলোর জন্য দোয়া শুরু করে রাখেন? অতএব, যখনই প্রয়োজন দেখা দিবে, তখনই এই মহান বান্দা তাঁর আল্লাহ্‌কে তাঁর নিকটে পাবেন, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটে তো তিনি বিদ্যমানই থাকেন। কিন্তু আমরা তাঁকে নিকটে প্রত্যক্ষ করে থাকি। অর্থাৎ বড়ই অদ্ভূত বিস্ময়কর বিষয়বস্তু যে, চৌদ্দশ' বছর পরও আঁ-হযরত (সা.)-এর দোয়া এমন ধারায় কবুল হচ্ছে যে, আমরা খোদাকে নিকটে দেখতে পারছি। কিন্তু নিকটে হয়ে থাকেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, আর ঐ নৈকট্যের দৃশ্যাবলীই আমরা অবলোকন করে থাকি। অতএব, সচ্ছলতা ও আরামের সময়ে আপনারাও এ

পদ্ধতিটিই রপ্ত করুন। ঐ দোয়াগুলো করবেন, যা দুটো দিকসম্পন্ন। একটি এই যে, সচ্ছলতা থাক, আরাম বিরাজ করুক এবং আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন না থাক, তবুও যেন আল্লাহ্‌র আবশ্যকতা থাকে। এই যে আল্লাহ্‌কে আমাদের প্রয়োজনের বিষয়টি, তা তো এই আয়াতে করীমায় অন্তর্নিহিত রয়েছে, যা আমি পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি- "যখন সে আমাকে ডাকে।" প্রয়োজন পূরণের সেখানে উল্লেখ নেই– একথা বলেননি, 'প্রয়োজন পূরণের জন্যে আমাকে ডাক' বরং বলেছেন, "আমাকে অন্বেষণ করতে থাকুক, আমাকে ডাকতে থাকুক– আমি যেন তাদের কাম্য হই। যদি তা-ই হয়, তাহলে এই সাধারণ দিনগুলোতে যখন কি-না খোদার কাছে চাওয়ার আবশ্যকতা থাকে না, তখনও খোদার অন্বেষণ বিদ্যমান থাকা উচিত। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই সকল বিষয় বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, সচ্ছলতা ও আরামের সময়ে যখন তোমাদের খোদা প্রয়োজনের খাতিরে স্মরণে না আসেন, তখনও খোদার খাতিরে যেন খোদা তোমাদের স্মরণে আসেন। তখনও যদি খোদাকে তোমরা ডাকতে থাক, তাহলে তোমাদের প্রত্যেক বিপদে ও সংকটে তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

অতঃপর হযরত আবু মূসা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস যা 'বুখারী, কিতাবুদ দায়ওয়াত বাব ফযলু যিকরিল্লাহ্' থেকে গৃহীত, তাতে আঁ-হযরত (সা.) বলেন, "যে তাঁর প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ করে, তাঁর 'যিকর' করে এবং যে করে না, এতদোভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।" অতএব, তোমাদের উচিত যেন জীবিত হও এবং তোমাদের জীবন যেন যিকরে ইলাহীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এমনি তো দুনিয়াতে চল ফির, পানাহার কর। যে অস্থায়ী জীবনকাল এখানে নির্ধারিত আছে, তা তোমরা পাবে-হয়ত তা সচ্ছলভাবে কেটে যাবে, না হয় দুঃখে-কষ্টে, যেমন কি-না তোমাদের ভাগ্যে রয়েছে, তারপর মরে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ হতে জীবন পায়, সে (আসলে) আল্লাহ্‌র স্মরণ বা যিকরের দ্বারা জীবিত হয় , সে মরে না। এ বিষয়-বস্তুই প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে। নইলে, বলতে পার, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করল, সে-ও মরে গেল, আর যে করল না, সে-ও মারা গেল। যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করেছে সে কখনও মরে না, কেননা , আল্লাহ্ কখনও মারা যান না। কাজেই আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দরুন সে ব্যক্তি চিরস্থায়ী-জীবন পেয়ে যায়, যা ইহকালীন জীবনের সাথেও সম্পর্কযুক্ত এবং পরকালীন জীবনের সাথেও। সহীহ্ মুসলিমে উক্ত বিষয়েরই আরেকটি হাদীস নিম্নরূপঃ

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে গৃহে আল্লাহ্‌র যিকর করা হয় এবং যে গৃহে করা হয় না এতদোভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (মুসলিম কিতাবুস সালাত, বাব ইস্তেজাবু সালাতিল্ নাফেলাতে ফি বায়তিহি ওয়া জাওয়াযিহা ফিল মাসজিদে)। এ হাদীসটি আমাদেরকে এ বিষয়ে মনোযোগী ও সচেতন করে তোলে যে, একটি গৃহে বসবাস করে যদি কিছু পরিবার-সদস্য মৃতবৎ হয়, যারা যিকরে ইলাহী করে না-তাঁকে স্মরণ করে না, তাহলে যারা যিকরে ইলাহী করে, তাদের ফয়েয ও কল্যাণকর প্রভাব ঐ মৃতবৎদের উপর পৌঁছতে ও পড়তে পারে। এভাবে ঐ ঘরকে আল্লাহ্ জীবিত করে দিবেন। অতএব, অন্যেরাও যারা সেখানে থাকবে, তারাও কিছু কল্যাণ ও ফয়েয পেতে পারে। কাজেই বিশেষতঃ ঐ সকল লোক যাদের সন্তানদের মাঝে, যাদের পরিজন ও আত্মীয়দের মধ্যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র বিমুখ লোক রয়েছে, তারা এ হাদীসটি দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদের গৃহের সঞ্জীবনের উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ্‌র যিকরের দ্বারা সারা ঘর জীবিত হয়ে যায়। কেবল তাদের নিজেদের পর্যন্তই তা সীমিত না থাকে।

হযরত উমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস প্রসঙ্গেই আমি সমগ্র জামাতের সমীপে দোয়ার জন্য অনুরোধ করে এসেছি। এদিনগুলোতে বিশেষরূপে দোয়া হওয়া উচিত এবং এই দোয়ার যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, তা আঁ-হযরত (সা.)-এর এই সুন্নতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, যা হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা.) রেওয়ায়াত করেন, উমরার জন্যে আমি আঁ-হযরত (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি প্রদান করলেন আর সেই সাথে বললেন, "হে আমার ভাই! আমাদেরকে তোমার দোয়ায় ভুলে যেও না।" উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সত্তা ছিলেন তিনি, আজীবন যিনি সমস্ত জাহানের জন্য দোয়া করতে থাকেন, পূর্ববর্তীদের জন্যও এবং পরবর্তীদের জন্যও এবং কিয়ামতকাল অবধি, যাঁর দোয়াসমূহ হচ্ছে আমাদের পুজিঁ, তাঁর বিনয়ের মোকাম ও মর্যাদা লক্ষ্য করুন, তাঁর অমায়িকতা দেখুন। হযরত উমরকে (রা.) বলেন, হে আমার ভাই! নিজের দোয়াতে আমাদের কথা ভুলে যেওনা। হযরত উমর (রা.) ঐ মহান ব্যক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতেন। তাই যখন তাঁকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তা বলেন তখন হযরত উমর (রা.) বলছেন, 'হুযূরের সে কথায় আমি নিজেকে এতো আনন্দিত বোধ করি যে, এর বিনিময়ে যদি সারা দুনিয়া আমি পেয়ে যাই তবুও ততোটা আনন্দ বোধ করবো না।' তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)।

দোয়ার জন্যে বলাতে তিনি এজন্যই খুশী হয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে নিজের জন্য দোয়ার ঐ যে সনদ প্রদান করলেন তা থেকে তিনি দোয়ার কবুলিয়তের সুসংবাদ পেয়ে যান। যদি হযরত উমরের দোয়া কবুল হবার বিষয়ে এবং যে খাঁটি নিয়্যত ও নিষ্ঠার সঙ্গে হযরত উমর (রা.) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন সে সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.)-এর খেয়াল না হতো, তাহলে কখনও রসূলুল্লাহ (সা.) উমরের (রা.)-কে নিজের জন্যে দোয়ার কথা বলতেন না। হযরত উমরের (রা.) তত্ত্বজ্ঞানের দিকেও লক্ষ্য করুন রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেমন আল্লহ্‌র তত্ত্ব-পরিচিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন তেমনি আল্লাহ্‌র এই মহান বান্দা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে হযরত উমরও (রা.) কিছুটা জানতেন। এ কারণেই তিনি খুশী হন। নইলে প্রত্যেকে বলবে, 'দেখো! আমাকে দোয়ার জন্য বলেছেন, আমি তাতে অত্যন্ত খুশী হয়েছি।' সে তার মধ্যকার অহমিকার দরুনই খুশী হচ্ছে। পক্ষান্তরে, হযরত উমরের মধ্যে কোন অহমিকা ছিল না–রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে দোয়ার জন্য বলাতে স্ফীত হয়ে তিনি খুশী হচ্ছিলেন না। বরং খুশী এজন্যে হচ্ছিলেন যেমন আগেই আমি বর্ণনা করেছি যে, তিনি (রা.) জানতেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দোয়ার জন্য বলায় একটি সুসংবাদ নিহিত ছিল যে, তাঁর (রা.) দোয়া কবুল হবে, এর মোকাবেলায় যদি সমস্ত দুনিয়া পেতেন তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে নির্জন নিবিড় চিন্ততার ব্যাপারে সে যেন পৃথক এবং গোপন থাকে। অন্য কেউ যেন তার ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারন না হয়। উল্লেখিত বিষয়টি যেন আমাদের এ'তেকাফকারীরা দৃষ্টিপটে রাখেন।

এখন, লাইলাতুল-কদরও হয়ত এ দিনগুলোতেই আসবে। আল্লাহ্ ভাল জানেন কে এর সৌভাগ্য পাবে আর কে পাবে না। কিন্তু যারই এ সৌভাগ্য লাভ হয়, অথবা অন্ততঃ যার এই ধারণা থাকে যে, এই লাইলাতুল কদর পাবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটবে, তাঁর পক্ষে আঁ-হযরত (সা.)-এর ঐ দোয়াটি কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যা কি-না লায়লাতুল-কদরের দোয়াসমূহের প্রাণ-স্বরূপ। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি আঁ-হযরত (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যদি জ্ঞাত হই যে, তা লাইলাতুল-কদর বটে, তাহলে সে মুহূর্তে আমি কি দোয়া চাইব? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তখন এই দোয়া করো; "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউয়্যুন, তুহিব্বুল আফ্ওয়া, ফা'ফু আন্নি" (জামে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)। –হে আমার আল্লাহ্! তুমি অত্যন্ত মার্জনাশীল, অত্যন্ত উপেক্ষাকারী, "তুহিব্বুল আফ্ওয়া" এবং উপেক্ষা করাই তুমি পসন্দ কর, "ফা'ফু আন্নি"– অতএব আমার ক্ষেত্রে উপেক্ষা কর (এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আমাকে দেখ)। তরজমাকারীগণ তরজমা করেছেন, আমাদেরকে বখশে দাও, ক্ষমা কর। অথচ "আফুউয়্যুন"–এর অর্থ এখানে ক্ষমা করা বা বখশে দেয়া নয়। তা এর আগের স্তর। যদি তা পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটে, তা হলে অবলীলায় সে-ব্যক্তি ক্ষমাই পেয়ে গেল। 'আফুউয়্যুন' দ্বারা বুঝায় যে, আমাদের তথা সমস্ত মানুষের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সদয় দৃষ্টিতে উপেক্ষাকারী এবং তাঁর (প্রিয়) বান্দাদের দুর্বলতাগুলোও তিনি উপেক্ষা ও মার্জনা করে থাকেন। যখন উপেক্ষা করা হয়, তখন দুর্বলতা যেন আর থাকেই না, মার্জনা করে দেয়া হয়। অতএব ক্ষমার পূর্ববর্তী স্তর হচ্ছে'আফ্উ"-এর স্তরটি। যদি 'আফ্উ'-এর সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহলে ক্ষমা বা 'বখশিশ' যেন এমনিতেই 'আফ্উ'-এর কল্যাণেই লাভ হল।

সুতরাং এখানে রসূলুল্লাহ (সা.) 'ফাগ্ফিরলি'-এর দোয়া শিখাননি। তা এজন্যেই যে, ক্ষমা প্রদর্শন ব্যতিরেকেই 'আফ্উ' মূলতঃ পরিপূর্ণ এবং প্রথম ও প্রধান স্থানবিশিষ্ট, যদি আল্লাহ্ তা'লা আজীবন স্বীয় বান্দাদের সাথে 'আফ্উ' সুলভ ব্যবহার করেন এবং তার পাপসমূহ উপেক্ষা করতে থাকেন তাহলে এর ফলাফল কী হতে পারে? দুটি ফল হতে পারে। একটি ভাল আর একটি মন্দ। ভাল ফলটি তো এই যে, 'আফ্উ'-এর ফলশ্রুতিতে মানুষের অন্তরে তাঁর সম্বন্ধে মাহাত্ম্যবোধ এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রতিনিয়ত সে চেষ্টা করে যেন এমন মওকা না আসে যখন তিনি আমার গুনাহ্র কারণে আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আরম্ভ করেন-মন্দ চোখে আমাকে দেখেন। এ সেই ফল, যার দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে মনোযোগী করেছেন এবং লাইলাতুল-কদরের দোয়ার ক্ষেত্রে এরচে' উত্তম ও অধিকতর দোয়া আর কী হতে পারে? অপর ফলটি হতে পারে পাপের স্পর্ধা। আপনারা বাড়ীতে শিশু সন্তানদেরকে তাদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কখনও যদি শাসন না করেন, সবসময় যদি উপেক্ষা করতে থাকেন, তাহলে মন্দ কাজে তাদের স্পর্ধা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কাজেই আঁ-হযরত (সা.) লাইলাতুল কদরের সময় গুনাহ্র স্পর্ধার দোয়া তো অবশ্যই শিখাচ্ছিলেন না। সেজন্যই, এ দোয়াটিতে সে অর্থই নিহিত যা আমি বর্ণনা করেছি। এ দিক দিয়ে 'আফ্উ' গুফ্রানের উর্ধ্বতন স্থান বটে। অর্থাৎ যখনই খোদা 'আফ্উ' সুলভ ব্যবহার করেন তখন সহসা আপনাদের মনোযোগ সে দিকে নিবদ্ধ হোক। অনেক সময় মানুষ ঠাহর করতে সক্ষম হয়, এবং ভুল করার সময় মানুষ বলে যে, আমি ভুল করছি। তখন সহসা খেয়াল হয় যে, আরে! যে খোদা একজন আছেন, তিনি আমাকে প্রত্যক্ষ করেছেন; আর তখন অন্তর থেকে দোয়া নির্গত হয়, তিনি যেন উপেক্ষা করেন। এরপর যখনই ভুল সংঘটিত হতে যাবে, এই খেয়াল তখন অন্তরে নিশ্চয় জেগে উঠবে।

তারপর, এ খেয়ালও তো জাগ্রত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্র কল্যাণ দৃষ্টি থেকে আমি কেন-ই বা এক মুহূর্তও পৃথক বা বঞ্চিত থাকি। শুধু কি এজন্য যে, আমি দুর্বল এবং গুনাহ্তে বার বার লিপ্ত হয়ে পড়ি? এটা এই দোয়ার এক স্বভাবিক ফল, একটি যৌক্তিক পরিণতি, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ চায়, আল্লাহ্ যেন আমাদের ওপর থেকে তাঁর সদয়-দৃষ্টি আর কখনও না সরান, অর্থাৎ গুনাহ্র দরুন তাঁর দৃষ্টি না ফিরান তা নয় বরং গুনাহ্ করার ক্ষমতা অর্থাৎ গুনাহ্ করার সাহসই যেন আমাদের রহিত হয়ে যায়। তারপর খোদার সদয়-দৃষ্টি আমাদের ওপরে যেন এরূপে পড়তে অবলোকন করি যে, তিনি যেন সম্পূর্ণ সুদৃষ্টিতে আমাদেরকে দেখেন, এটা 'আফ্উ' বিরোধী নয়। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই দোয়া করেন যে, "প্রত্যেক অবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আমায় দেখছেন, আল্লাহ্ আমায় দেখছেন–"সুবহানা মাইঁ ইয়ারানী"–'পবিত্র তিনি, যিনি সদা আমায় দেখেন,' এর অর্থ এই যে, আমি তো আল্লাহ্র খাতিরে নিজের অন্তঃকরণকে মেজে-ঘষে এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি এবং আল্লাহ্ ও আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করেন যে, যদি কোন ত্রুটি অবশিষ্ট থেকেও যায়, তাহলে তিনি (মার্জনা-সুন্দর দৃষ্টিতে) তা উপেক্ষা করেন। এমনকি, এখন আমি এই আকাঙ্ক্ষা রাখি যে, প্রত্যেক অবস্থায়, সব দিক দিয়ে আমার অভ্যন্তরের সর্বত্র খোদাতাআলা যেন সদয় দৃষ্টিপাত করেন এবং সর্বদা আমাকে হিফাযত করতে থাকেন।

অতএব, হাদীস বর্ণিত এ সেই দোয়া, যা (এই রাতগুলোতে) চাওয়ার সময় উল্লেখিত বিষয়-বস্তুটি অবশ্যই দৃষ্টিপটে রাখুন। অন্যথায়, যদি এই দোয়া চাওয়া হয় যে, হে খোদা! আমরা গুনাহ্ করতে থাকি আর তুমি তা উপেক্ষা করতে থাকো; তাহলে তা গুনাহ্‌র স্পর্ধা উদ্রেকের কারণ হবে, গুনাহ্‌র প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করবে না। অতএব, উক্ত বিষয়বস্তুটি দৃষ্টিপটে রেখে এখন আমি দোয়াটির পুনরাবৃত্তি করছি। আরবি শব্দ যদি মনে না থাকে তাহলে এর অর্থ বিষয়বস্তু স্মরণ রেখে দোয়াটি করতে থাকুন।"হে আমার আল্লাহ্! তুমি 'আফ্‌উ'-কারী "ইন্নাকা আফুউয়্যুন।" এর আসল অর্থ, পরিপুর্ণ 'আফ্‌উ'। 'তুহিব্বুল আফ্-ওয়া'-'আফ্‌উ'-কে ভালবাস, পসন্দ কর। "ফা'ফু আন্নি" অতএব তুমি আমার প্রতিও 'আফ্‌উ' কর (অর্থাৎ সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপে আমার দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা কর এবং সেগুলো সম্পূর্ণ দূর করে আমার প্রতি সর্বদা তোমার পরিপুর্ণ প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। সদা আমাকে হিফাযত কর। উক্ত সব বিষয়-ই 'আফ্‌উ'-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত –অনুবাদক) এই দোয়াটি যে অর্থে আমি বর্ণনা করেছি যদি আপনারা তা সেভাবে করেন তাহলে এই দোয়াতে আমাদেরকেও স্মরণ রাখবেন। সমগ্র জামাতকে তাতে শামিল রাখুন এবং সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের দোয়ার অন্তর্ভুক্ত করুন। কেননা আমরা চাই এই রমযানের ফয়েয দ্বারা আহমদীয়া জামাত যেন সমস্ত দুনিয়াকে কল্যাণমন্ডিত করে তুলতে সক্ষম হয়।

রমযানের শেষ দশকের শেষ দিকে একটি শুক্রবার আসবে যাকে মানুষে 'জুমুআতুল বিদা' বলে থাকে এবং এর সম্পর্কে আমি সবসময় বলে থাকি যে, এই শুক্রবারটিকে (প্রকৃতপক্ষে) 'জুমুআতুল ইস্তেকবাল' বলা উচিত, বিদা (বিদায়) নয়, বরং ইস্তেকবাল (সংবর্ধনাজ্ঞাপন-মূলক জুমুআ)। অধিকতর আগ্রহ ও আয়োজনে এর সংবর্ধনা করুন। কেননা, ওরূপ জুমুআ (এ বছর) পুনরায় আপনাদের ভাগ্যে জুটবে না। অতএব, এর ইস্তেকবাল বা সম্বর্ধনা এভাবে করুন যাতে এটা আপনাদের কাছেই অবস্থান করে অর্থাৎ এর বরকত ও আশিসসমূহ যেন আপনাদেরই হয়ে যায়। অনেক সময় আপনারা বড় লোকদের সম্বর্ধনা দিয়ে থাকেন। তারা আসেন এবং তারপরেই চলে যান। ওটা ইস্তেকবালও এবং বিদায়ও। কিন্তু যদি এরূপ প্রিয়জনকে অভ্যর্থনা করেন যাকে নিজের ঘরেই বসিয়ে নেন, সাদরে রেখে দেন, তাকে স্বীয় অন্তর থেকে আর কখনও পৃথক হয়ে সরে যেতে না দেন তাহলে এই সম্বর্ধনাটি হচ্ছে আরেক ধরনের মর্যাদাপূর্ণ সম্বর্ধনা। অতএব, রমযানের শেষ দশকের আগামী জুমুআকে আমি এই অর্থে (বিদায়ের পরিবর্তে) সম্বর্ধনা-মূলক জুমুআ বলে অভিহিত করছি। তাই এরূপে এর সম্বর্ধনা করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাদের ভালবাসা এবং ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে আপনাদের কাছেই অবস্থান গ্রহণ করেন এবং রমযানের এই যাবতীয় বরকত ও আশিস যেন সারা বছর ব্যাপী আপনাদেরই হয়ে যায়।

এই ভূমিকার সাথে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি সমূহ উপস্থাপন শুরু করছি। একটি উদ্ধৃতির সামান্য অংশ বর্ণনা করতে পারবো। বাকী ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামী জুমুআর খুতবায়। "যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।" এটা সেই আয়াতেরই তফসীর, যার কিছু ব্যাখ্যা আমি পূর্বে করে এসেছি। "যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, খোদার অস্তিত্বের উপর দলীল কী? তখন এর জবাব এই যে, আমি অতি নিকটে বিদ্যমান অর্থাৎ বড় কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই, আমার অস্তিত্ব অতি নিকটতম পথে (বা পন্থায়) বোধগম্য হতে পারে এবং অত্যন্ত সহজ উপায়ে আমার অস্তিত্বের উপর দলীল নির্ণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সে দলীল এই যে, যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার প্রার্থনা শ্রবণ করি এবং স্বীয় ইলহাম (ঐশীবাণী) দ্বারা তাকে সাফল্যমন্ডিত হবার সুসংবাদ দান করি।" এ অর্থটি হচ্ছে, আমি যা উপস্থাপন করেছিলাম তদ্ব্যতীত অপর একটি অর্থ। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ চাও তাহলে তোমরা নিজেরা এরূপ হয়ে যাও যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে আরম্ভ করেন। যখন সাড়া দিতে আরম্ভ করবেন তখন তোমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলিল-স্বরূপ হবে। যদি তিনি তোমাদের দোয়া না শোনেন অর্থাৎ তোমরা তাঁর থেকে দূরে থাক তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের পক্ষে কোন দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হতে পার না। "যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার কথা শুনি এবং স্বীয় ইলহাম দ্বারা তার সফলতার বিষয়ে সুসংবাদ দেই।"

এখন স্পষ্ট যে, এই রমযানের এই দশকে, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হবে আল্লাহ্ তাকে স্বীয় নৈকট্য দ্বারা ভূষিত করবেন, তাকে বহু রকম সুসংবাদ রুইয়া সালেহা (সত্যস্বপ্ন), কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন) ও ইলহামসমূহের মাধ্যমে দান করবেন, যদ্বারা আমার (আল্লাহ্‌র) অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাসই নয়, বরং সর্বশক্তিমান হওয়াও সন্দেহাতীত বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছায়।" অর্থাৎ কেবল মাত্র এ উপায়েই তোমাদের বোধগম্য হবে যে, খোদা বিদ্যমান আছেন। বরং যখন তিনি তোমাদের দোয়াসমূহ শ্রবণ করবেন তখন সর্বশক্তিমান হবারও প্রমাণ দিবেন। অর্থাৎ তোমরা তাঁর নিকট যা প্রার্থনা কর তা তোমাদের দানও করেন। অতএব, কুদরত (ক্ষমতা) ব্যতিরেকে কী করে দান করতে পারেন! অতএব, এরূপে দোয়া কর যাতে তা শ্রবণ ও গ্রহণ করেন এবং তাতে তাঁর কুদরতের নিদর্শনও প্রকাশিত হয়।

"কিন্তু মানুষের উচিত যেন নিজেদের মধ্যে তাকওয়া এবং খোদাভীরুতার এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে তাদের দোয়া আমি শ্রবণ করি। আর উচিত, তারা যেন আমাতে ঈমান আনয়ন করে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তার আগে তারা স্বীকার করুক যে, খোদা বিদ্যমান আছেন এবং তিনি সবরকম শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন। কেননা, যে-ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে অভিজ্ঞতামূলক তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়।" অতএব, যেহেতু এ উদ্ধৃতিটি ছাড়া অন্যান্য উদ্ধৃতির জন্য এখন আর সময় নেই, সেজন্য ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামী খুতবায় নতুন কোন বিষয় বস্তু শুরু করার পরিবর্তে এ বিষয়টি-ই অব্যাহত থাকবে এবং পরবর্তী উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপিত হবে।

(পুনর্মুদ্রিত)

অনুবাদ : **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঈদুল ফিতরের খুতবা

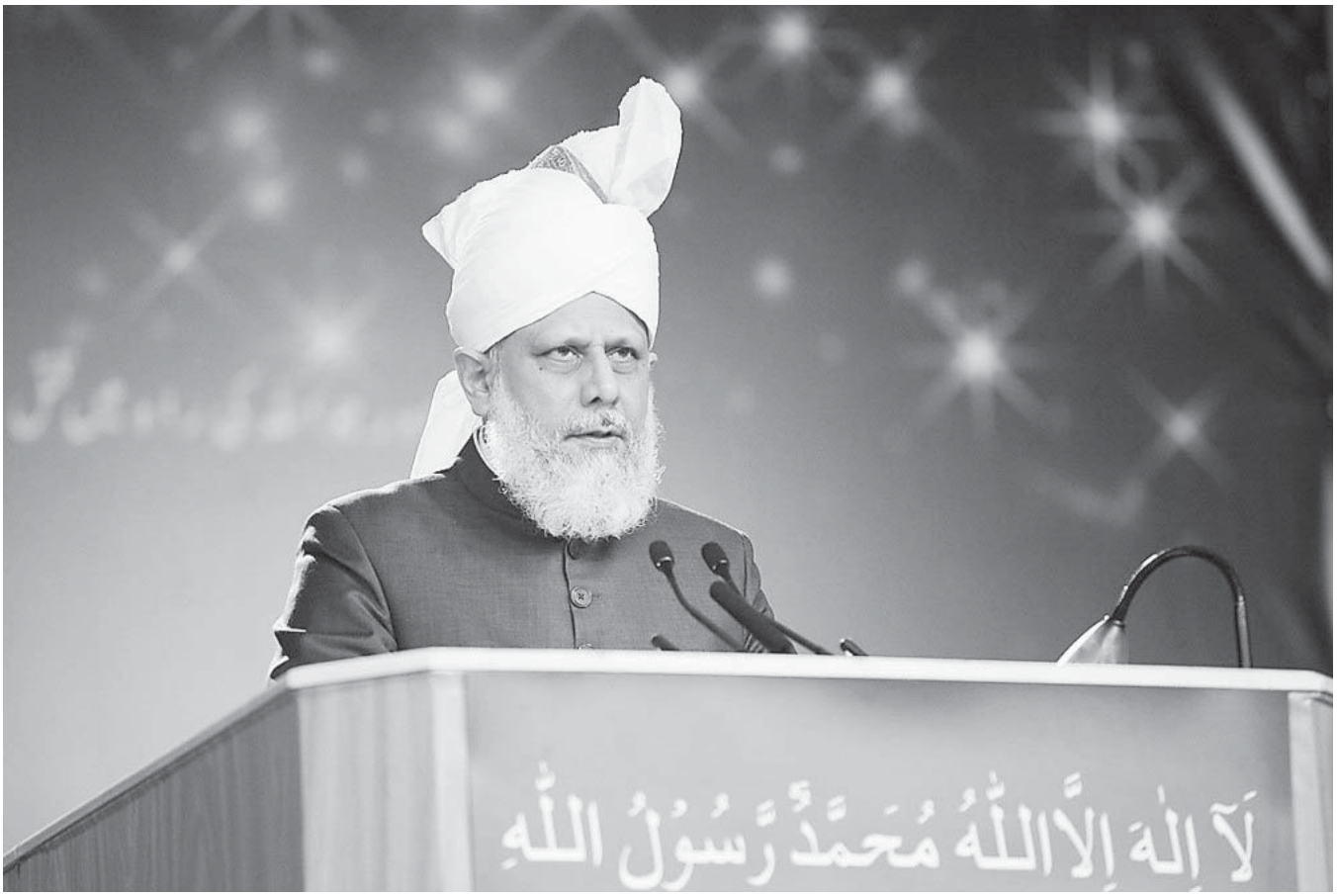

জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৭ জুলাই, ২০১৬ ঈদুল ফিতরের খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাআউ'য ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন–

আজ পবিত্র ঈদের দিন এবং মুসলমানরা এদিনে সমবেত হয়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যেখানেই তারা বসবাস করুক না কেন ঈদ উদযাপন করে। কোন কোন এলাকায় আজ ঈদ হচ্ছে কোথাও কোথাও গতকাল ঈদ হয়ে গেছে। যাহোক, এখানেও মুসলমানরা বাস করে। রমযানের পরে তারা ঈদ উদযাপন করে। সত্যিকার ঈদ, সত্যিকার মু'মিন এ বিষয়ে আনন্দিত যে, আজ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাস অতিক্রম করে এক জায়গায় সমবেত হয়ে আনন্দ উদযাপন করার, নিজেদের ইবাদত করার তৌফিক দিচ্ছেন। আর সত্যিকার অর্থে আনন্দ ও ঈদ সেটিই যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। এই ঈদ শুধুমাত্র মুসলমান বা ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বিশ্বের সকল জাতি ও ধর্মে বিভিন্ন দিন ঈদ উদযাপন করা হয় অথবা অনেক এমন উৎসবের

ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা আনন্দের সাথে উদযাপিত হয়। আর সর্বত্র ঈদের দিন সম্পর্কে এই বিশ্বাস বা এই শিক্ষা রয়েছে যে ঈদ-আনন্দের বা ঈদের দিনে জাতির লোকেরা একস্থানে সমবেত হয়ে আনন্দ উৎসব করবে আর সাধারণত: এই চিন্তাধারাই সবার মাঝে বিরাজমান। যখন সবাই সমবেতভাবে ঈদ উদযাপন করবে অর্থাৎ আনন্দ বা খুশীর ব্যবস্থা করবে তখন উক্ত পরিবেশের কারণে অধিকাংশ মানুষের মধ্যেকার টানা-পোড়েন দূর করা সম্ভব হবে। কৌতুক এবং হাসি-আনন্দ কিছু সময়ের জন্য মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করে সাময়িকভাবে তাদের মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করবে, এটাই মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। শিশুদের মধ্যে যদি আমরা তাকাই তাহলে এ বিষয়টি আমরা দেখতে পাই যে, শিশুরা কিছুদিন আলাদাভাবে যদি একলা কাটায় তাহলে তাদের মধ্যে একটা খিটখিটে স্বভাব সৃষ্টি হয়।

কিন্তু তারা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকলে, খেলাধূলা করলে তারা থাকে উৎফুল্ল। আর এটি জানা কথা যে, খেলাধূলার ফলে শিশুরা ক্লান্তও হয়, অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধূলা করার সময় খুনসূটি-ঝগড়া ইত্যাদিও হয় তারপরও তাদেরকে আনন্দিতই মনে হয়, সতেজ-সজীব দেখায়। বাচ্চাদের চিন্তাচেতনা অনুসারে তাদের জন্য ঈদ এটাই, আনন্দের এই উপলক্ষই তাদেরকে আনন্দ দেয়। এতে করে তাদের বেশ উপকার হয়, যা তাদের মানসিক সতেজতার উপকরণ সৃষ্টি করে। যে বাবা-মায়ের সন্তানরা অন্যদের সাথে মিলেমিশে খেলাধূলা না করে নির্জনতা পসন্দ করে, এক কোণায় নিভৃতে পড়ে থাকে, তাদের পিতা-মাতা এতে চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, সম্ভবত: রোগে আক্রান্ত হয়ে আমাদের সন্তান মানসিক বিষন্নতায়, বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যাহোক মানুষের প্রকৃতিই এমন। মানুষ যদি মিলেমিশে থাকে আর এভাবে আনন্দ উদযাপন করে আর এমন পরিবেশ এবং সুযোগ সৃষ্টি করে যেখানে অধিকাংশ মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে আনন্দ উৎসব করে তাহলে মানবীয় প্রকৃতির এই যে প্রকাশ তা বড়দের মাঝেও আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। আর দুঃখ ও বেদনার যে পরিবেশ সেটি বেদনার প্রভাব বিস্তার করে মানুষের ওপর।

অতএব, কষ্টকে আনন্দে বদলে দিতে অনেক মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে আর তারা মনে করে যে, মানসিক যে ক্লেশ ও কষ্ট, উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য মদপান করা বা অন্যান্য নেশাজতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবে। অথচ বাস্তবতা হল এসব জিনিস মানুষের অশান্তি বা অস্থিরতা আরো বাড়িয়ে দেয় আরো অশান্তির দিকে নিয়ে যায় পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্য হানি হয়। যাহোক কথা হচ্ছিল মানব প্রকৃতির ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে মানুষ অনেক সময় ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে দুঃখভারাক্রান্ত হয় কিন্তু সাময়িক আনন্দের যে পরিবেশ সাময়িক ভাবে হলেও সেটি তাকে আনন্দিত করে আর দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও সে হাসতে আরম্ভ করে।

আর এভাবে তার দুঃখের বোঝা কিছুটা হলেও লাঘব হয়। এই যে, মানবপ্রকৃতি ও মানবস্বভাব একে দৃষ্টিতে রেখে আজকাল বা বর্তমান যুগের স্বার্থপর ও জগত লোভীরা মানুষকে বিভিন্ন নেশা বা অন্যান্য অপকর্মে জড়িয়ে দিচ্ছে, এতটাই তাদেরকে নোংরামিতে জড়িয়ে ফেলেছে যে তারা ধীরে ধীরে নোংরামিতে নিমগ্ন হচ্ছে আর ধর্ম ও খোদা তা'লা থেকে অনেক বেশী দূরে সরে গেছে। তাদের ঈদ আর আনন্দ, সাময়িক।

প্রথমত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে পার্থিবতামুখী এসব লোকের কাছে ঈদ অনুষ্ঠানের ধর্মীয় তাৎপর্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই, লোক দেখানোর জন্য তারা ঈদ উদযাপন করেও থাকে প্রচলিত একটি রীতি পালন করে এতে কোন ধর্মনুশীলন নেই। শুধু বাহ্যিক হাসি-আনন্দ, মদ এবং পানাহার ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী মাত্র। তাদের ঈদ কেবল জাগতিক আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব।

ক্রিসমাস বা অন্যান্য উৎসবের যে দিন রয়েছে তা নিছক আনন্দের কিন্তু আমাদের যে ঈদ তা পুরোপুরি ভিন্ন। আর ভিন্নই হওয়া উচিত, এবং ইসলাম, ঈদের যে শিক্ষা উপস্থাপন করে তা আমাদের কামনা-বাসনাকে সংযত করে খোদামুখী করায়। অন্যান্য জাতির যে ঈদ বা উৎসব রয়েছে তা সাময়িক আনন্দ মাত্র। তাদের যতগুলো উৎসব রয়েছে তার মধ্যে কেবলই সাময়িক আনন্দ। কিন্তু মু'মিনের যে ঈদ তা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে স্থায়ী আনন্দে রূপ নেয়, চিরস্থায়ী আনন্দের কারণ হয়। এই ঈদে জাগতিক চাকচিক্য দৃশ্যমান হউক বা না হউক বাহ্যিক যে বিষয়ের উল্লেখ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) করেছেন, তা আমি নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা পূরণের দাবী হলো তার পেট পূর্ণ করা। তার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাকে এমন নোংরা খাবার দেয় যাতে তার পেট ভরতে পারে কিন্তু তাতে সে অসুস্থ্য হয়ে যাবে। পেট হয়তো ভরবে কিন্তু কয়েক প্রকার রোগের আক্রমণ ঘটবে, তার পিপাসা নিবারনের জন্য পানি হয়তো সরবরাহ করা হবে, কিন্তু সেই পানি এমন নোংরা, বিস্বাদ এবং নোনতা যে তার পিপাসা সাময়িক নিবারণ হলেও পরে তা আরও প্রকট রূপ নেয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি ঐ পানি পানে হয়তো বাধ্য হবে কারণ সে পিপাসায় মরার উপক্রম হয়েছে, পিপাসায় সে মারা যাচ্ছে বা তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। এতে নানা রোগ ব্যাধিতে সে আক্রান্তও হবে, তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিপদগ্রস্ত হবে। এইভাবে তার সাময়িক কষ্ট হয়তো দূর হয়েছে কিন্তু নানা স্থায়ী রোগ তাকে কাবু করে ফেলবে, যা তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবে এবং স্থায়ীভাবে সে কষ্ট পেতে থাকবে। সেই ব্যক্তি যে পিপসার্ত বা ক্ষুধার্তকে এমন ধরনের খাদ্য পানীয় সরবরাহ করেছে সে বিবেক বুদ্ধি

বর্জিত এক মানুষই বটে। পক্ষান্তরে অপর এক ব্যক্তি যে ক্ষুধার্ত কোন ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ খাবার ও পানীয় খাওয়ায়, শীতল পানীয় পান করায়, তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এমন ব্যক্তি-ই প্রকৃত সহানুভূতিশীল। অন্যরা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত মানুষের ক্ষুধা ও পিপাসার চাহিদা অনুধাবনও করেছে, কিন্তু চাহিদা মিটানোর জন্য যে উপকরণ সৃষ্টি করেছে তা সাময়িক আনন্দের কারণ হয়েছে ঠিক; কাজ করেছে, কিন্তু স্থায়ীভাবে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছে এবং আধ্যাত্মিকভাবে তা হচ্ছে তার জন্য ধ্বংসাত্মক। এজন্য স্থায়ী আনন্দের পানি পান সম্পর্কিত যে দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি, এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, আজকের যুগে জামাতে আহমদীয়া যেখানে বিশ্বের মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করছে সেখানে এই আধ্যাত্মিক পানীয়র সাথে জাগাতিক পানিও সরবরাহ করছে।

উন্নত বিশ্বে, সচরাচর যারা আসেন তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে হয়তো পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু তাদের দেশেরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে মরু এলাকায়, নোংরা পুকুরের পানি বা এমন পানি যা মানুষ পান করে, তা পিপাসা আরো বাড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে আফ্রিকায় বসবাসকারী মানুষ পুকুরের পানি পান করে বা এমন কূপের পানি যেখানে বৃষ্টি বা অন্যান্য উপায়ে পানি এসে জমা হয়। এই পানি তারা ব্যবহার করে আর এই পানি এত নোংরা হয়ে থাকে যে, মানুষ পিপাসায় মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া এই পানি পান করতে চায় না। এখানে যারা বসে আছেন তারা সেই পানি পান করার কথা কল্পনাও করতে পারবেন না। এমন জায়গা থেকে মানুষ পানি সংগ্রহ করে, আর বিভিন্ন পশুও সেই একই স্থান থেকে পানি পান করে। বরং বিভিন্ন পশুর পেশাব পায়খানাও ঐ পানির সাথে মিশ্রিত থাকে। সেখানে আমরা যখন কোন নলকূপ বসাই বা কূপ খনন করি মানুষের আনন্দের আর সীমা থাকে না। এখানে কেউ হাজার পাউন্ড পেলেও এতটা আনন্দিত হবে না, যা প্রথমবার পানি দেখে ওই মানুষেরা হয়।

আমাদের স্বেচ্ছাসেবী যুবক আফ্রিকায় যারা সেখানে এই কাজের উদ্দেশ্যে এখান থেকে যায় তারা এই অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। তারা এসে বলে যে, তারা কি ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। তারা ছবিও দেখায় যে, কীভাবে ছোটরা বড়রা মহিলারা এই খুশীতে আনন্দে উচ্ছাসে লাফিয়ে উঠেছে যে তারা পরিষ্কার পানি লাভ করেছে যেন এই দিনটি তাদের ঈদের দিন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি অবস্থাসম্পন্নদের বলব যে, হিউমেনিটি ফার্স্ট এবং আই ট্রিপল এ,ই বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপনের এবং পানি সরবরাহের কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে সাহায্য করার সামর্থ যারা রাখেন তাদের উচিত সাহায্য করা।

যাহোক আমি আবার সেই মূল বিষয়ে ফিরছি যে অমুসলিমদের ঈদ এবং আমাদের ঈদের মাঝে পার্থক্য কি? অন্যদের ঈদ হলো নাচ-গান করা, নোংরা ও অশ্লীল গান-বাজনা করা, পানাহার করা, গল্প গুজব করা, খেলাধূলায় মত্ত থাকা, ক্রয়-বিক্রয় করা আর পক্ষান্তরে আমি যেভাবে বলেছি প্রকৃত ইসলামী ঈদ, একজন মু'মিন বান্দার ঈদ হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমরা ঈদের দিন বলে থাকি, আস! আজ ঈদের দিন। আমরা সাধারণতঃ বছরের দিনগুলোতে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং স্বীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য পাঁচবার নামায আদায় করে থাকি, আজকে আমরা ছয়বার নামায আদায় করবো, একজন মু'মিন বান্দা আনন্দও উদযাপন করে, কেননা তা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। তাই আনন্দ উদযাপনকালে সুন্নত অনুযায়ী সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান কর, আতর লাগাও, এ দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে এটিও চান যে, তোমরা আনন্দ-খুশীও উদযাপন কর। আজ ভাল খাবার তৈরী কর, এবং খাও কেননা আজ আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার সুযোগ পূর্বের তুলনায় বেশি আছে।

সুতরাং এটিই হলো প্রকৃত ঈদ। আর এমন যদি না হয় এবং আমরাও যদি ঈদের নামাযের পর হৈ হুল্লা ও পানাহারে মত্ত হয়ে যাই এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতার মাঝে যদি কোন পরিবর্তন না আসে, রমযানে আমরা যা অর্জন করেছি তা ভুলে যাই, ঈদের নামাযের পর আমরা যোহর-আসরের নামাযকে ভুলে যাই এবং কেবলমাত্র জাগতিক কর্মকাণ্ডে ও খেলা-তামাশায় লিপ্ত হয়ে যাই তাহলে আমরাও সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাব যে কেবল নোংরা খাবার ও নোংরা পানি পেয়েছে। আর এগুলো তার পেটভরা ও পিপাসা নিবারণ করে আরাম ও তৃপ্তি দেয়ার পরিবর্তে অসুস্থ্য বানিয়ে দেয়। সে সাময়িকভাবে তৃপ্তি লাভ করে স্থায়ীভাবে নয়। বরং সে স্থায়ী কষ্ট ও দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হয়। আমরা এমন নির্বোধ হিসেবে গণ্য হবো, যে কি-না আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পাক-পবিত্র খাবার ও স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা পানি পরিত্যাগ করে নোংরা খাবারকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। যদি চিন্তা-ভাবনা এমনই হয় তবে আমাদেরকে কেই-বা বুদ্ধিমান বলবে? নোংরা খাবার সরবরাহকারীকে জালেম ও পাগল বলার পূর্বে আমাদেরকে পাগল এবং নিজ প্রাণের ওপর অত্যাচারকারী বলে আখ্যায়িত করবে যারা পরিচ্ছন্ন ও উত্তম খাবার, শীতল সুমিষ্ট পনীয়কে ছেড়ে নোংরা-খাবার ও পানিকে গ্রহণ করেছে!!

অতএব, আজ আমাদের বুদ্ধিমান হতে হলে ও নিজের ওপর সুবিচার করতে চাইলে নিজেদের নামায ও পুণ্যের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে। আজ ফরয নামাযের সংখ্যা বৃদ্ধি করে আল্লাহ্ তা'লা এটি বলছেন যে, মু'মিন বান্দার ঈদ

হলো, আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর সন্তুষ্ট হবে এবং মু'মিন বান্দা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পথে যতই অগ্রসর হতে থাকবে ততই তার ঈদ প্রকৃত ঈদে রূপান্তরিত হবে। অতএব, এই প্রকৃত ঈদ অর্জনের জন্য আমাদের সর্বদা চেষ্টায় রত থাকা উচিত। আমরা যদি এই নীতিকে বুঝতে সক্ষম হই তবে মু'মিন বান্দার প্রতিটি দিনই ঈদ হতে পারে। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি তোমরা চাও প্রতিদিন ঈদ পালন করতে পার, আর একজন মু'মিন বান্দার প্রকৃত ঈদ হলো, জান্নাত লাভ করা। মু'মিনের জন্য বছরের দু'টি ঈদ উদযাপনই কেবল খুশির মাধ্যম নয়, বরং সে তো আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে স্থায়ী ঈদ লাভ করতে চায়। **আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জান্নাত লাভ করাই হলো চিরস্থায়ী ঈদ।** এবং জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তার জন্য এ পৃথিবী থেকেই জান্নাতের সূচনা হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই কথার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, স্মরণ রেখ! খোদা তা'লার দিকে যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাকে কখনও বিনষ্ট করা হয় না। তাকে উভয় জগতের নিয়ামতরাজী দান করা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান** অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর শান ও মর্যাদাকে ভয় পায় তার জন্য দু'টি জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। ইহজগতে এবং পরকালেও। তিনি (আ.) আরো বলেন, আর এই প্রেক্ষিতে বলেন, কেউ যেন এটি না ভাবে যে, আমার পানে আগতরা দুনিয়া হারিয়ে ফেলে। বরং তাদের জন্য দু'টি জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে, একটি এই দুনিয়াতে আর অপরটি পরকালে।

সুতরাং এ হলো একজন প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদা যা আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করে থাকেন। যে ব্যক্তি তাঁর সন্তুষ্টির ঈদ অন্বেষণ করে তাকে সেই মর্যাদা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দুনিয়াবী ভাবেও দান করা হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবেও দান করা হয়। আর যাকে আল্লাহ্ তা'লা এভাবে ভূষিত করছেন তার জন্য এর চেয়ে বেশী আনন্দদায়ক আর কী ঈদ হতে পারে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একস্থানে বড় চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যেভাবে জাগতিক সরকার 'মেলা'-র আয়োজন করে থাকে আর তাদের উদ্দেশ্য থাকে, বিভিন্ন প্রকার পণ্য-সামগ্রী প্রদর্শন করে লোকদের পরিচিত করানো, এর দ্বারা যাতে তারা উপকৃত হয়। অনুরূপভাবে, আসল ঈদ হলো ঐশী রাজত্বের প্রদর্শনী। আর আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে জানান যে, যদি তোমরা চাও তবে প্রতিদিন ঈদ উদযাপন করতে পার। যেমন, **ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান**– এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, এই পার্থিব জগতের জান্নাত লাভ করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে প্রতিদিন ঈদ উদযাপন করতে পারো।

সুতরাং, ঈদ সেই বিষয়ের উপমা যে, এক মু'মিন খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের পথ অন্বেষণ করে এবং যখন খোদার নৈকট্য লাভের পথ পেয়ে যায় এবং খোদা তা'লা তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তখন এরচেয়ে খুশীর বিষয় আর কী থাকতে পারে? আর এটি এমন এক আনন্দের বিষয় যা পরিপূর্ণ প্রশান্তি দানকারী আনন্দ হয়ে থাকে যা এই দুনিয়াকেও জান্নাতে পরিণত করে এবং পরকালের জান্নাত লাভের পাথেয়ও প্রদান করে। যার প্রতি খোদা সন্তুষ্ট হন তার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়। ঈদসমূহে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আমলের ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের পথ। এবং একজন মু'মিন বান্দার জন্য এরচেয়ে বড় ঈদের দিন আর হতে পারে না, যখন খোদা তা'লা তার উপর সন্তুষ্ট হন।

মহানবী (সা.) এর পবিত্রকরণ শক্তি সাহাবাদের মাঝেও এই পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করেছিল। তাদের খুশি-আনন্দ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির মাঝে ছিল। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির মাঝেই তারা মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পেত। আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করা ছিল তাদের ঈদ। কিন্তু বাহ্যত তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, চরম দারিদ্রতার মাঝে তারা জীবন অতিবাহিত করত। তাদের মাঝে অধিকাংশ এমন ছিল যারা দু'বেলা দু'মুঠো খাবার পেত না। আজকাল আমরা গমের মিহি আটা খেয়ে থাকি, নরম আর গরম-গরম নানান ধরনের খাবার আমরা খেয়ে থাকি। আর ঈদে অসাধারণ খাবারের আয়োজনও আমরা করে থাকি। কিন্তু প্রাথমিক যুগে সাহাবাদের খাবার ছিল যবের আটা, তাও আবার চালনী দ্বারা চালা ছিল না। এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে এক সাহাবী সেই আটার বর্ণনা এভাবে দেন, প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন কি চালনীর ব্যবহার ছিল? আপনারা কি আটা চেলে খেতেন? তখন তিনি উত্তর দেন, পাথরের ওপর যব রেখে পিষতাম। তারপর ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করে মোটা ও চিকন অংশ পৃথক করতাম। তারপর যে চিকন আটা পাওয়া যেত তা দিয়ে রুটি বানাতাম, সেই রুটিও বহু কষ্টে গলা দিয়ে নিচে নামত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তার ক্ষুধার্ত থাকার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেধে রাখতাম। তিনি বলেন, একবার আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এমন এক স্থানে বসলাম যেখান দিয়ে লোকেরা যাতয়াত করত। আমার পাশ দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) যাচ্ছিলেন, আমি তাকে একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাকে খাবার খাওয়াবেন। সাহাবারা সরাসরি চাইতেন না। কিন্তু আমি যখন আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম আর আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি আঁচ করতে পেরে আমাকে খাবার দিবেন, কিন্তু তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করে চলে গেলেন। এরপর হযরত

ওমর (রা.) সে দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তার কাছেও আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি যেন আমাদের খাবার খাওয়ান। আমি ভিতরে ভিতরে ভীষণ জ্বলছিলাম যে, আমি যেন জানি না এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি, আমাকে শিখাতে এসেছে। তারপর মহানবী (সা.) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি আমাকে দেখলেন এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি (সা.) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আবু হুরায়রা আমার সাথে আস। তিনি (সা.) তার বাড়ী আসলেন এবং যখন ভিতরে যাচ্ছিলেন তখন আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমিও ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি (সা.) অনুমতি দিলে আমি ভিতরে প্রবেশ করি। সেখানে এক বাটি দুধ ছিল। তিনি (সা.) বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুধ কোথা থেকে এসেছে? জানা গেল, অমুক মহিলা উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছে।

তিনি (সা.) বলেন, আবু হুরায়রা! আসহাবে সুফ্‌ফাদের মাঝে যত জন আছে সবাইকে ডাক। আবু হুরায়রা বলেন, একথা আমি অপসন্দ করলাম। কেননা ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম দুধের এই বাটি পুরোটা আমি একা পেলেই খুব ভালো হতো কিন্তু আদেশ পালনের নিমিত্তে যাই এবং সবাইকে ডেকে আনি। তারপর আমি ভেবে ছিলাম তিনি (সা.) এই দুধের পেয়ালা সর্বপ্রথম আমাকে পান করতে দিবেন আর আমি তৃপ্তিসহকারে পান করব। কিন্তু তিনি (সা.) প্রথমে অন্য এক ব্যক্তিকে দিলেন, তারপর আরেকজনকে, তারপর আরেকজনকে দিলেন তিনি (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম আমি আর দুধ পাব না, এটি তো শেষই হয়ে যাবে। অতঃপর সেখানে উপস্থিত সাত-আট জন সবাই তৃপ্তি নিয়ে পান করল। তারপর মহানবী (সা.) আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! নাও, পান কর। আমি পান করলাম। তিনি (সা.) বললেন, আরো পান কর। আমি আবার পান করলাম আর পেট ভরে গেল। তিনি (সা.) বললেন, আরো পান কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আর বিন্দুমাত্র জায়গা নাই। অতঃপর রসূল করীম (সা.) সেই পেয়ালা উঠালেন এবং অবশিষ্ট দুধ নিজে পান করলেন। এরূপ ছিল তাদের দারিদ্রতার অবস্থা। কিন্তু অন্তর কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানী ছিল। যুদ্ধের ময়দানেও সাহাবাগণ শুকনো খেজুর খেয়ে এবং কয়েক ঢোক পানি পান করে সারাদিন যুদ্ধ করতেন। কিন্তু খোদা তা'লা তাদের এমনসব বিজয় দান করেছেন, তাদের এমনসব ঈদের দিন দেখিয়েছেন যা দুনিয়ার কেউ দেখেও নাই এবং দেখবেও না। বড় বড় বাদশাহ তাদের করতলগত হয়েছে। এই আবু হুরায়রা (রা.) কিসরার শাহী পোশাকের একটি রুমাল লাভ করেন। তিনি (রা.) সেই রুমালে থুতু ফেলেন আর বললেন, বাহ্! আবু হুরায়রা বাহ্! একটি সময় ছিল যখন তুই ক্ষুধার যাতনায় নিস্তেজ হয়ে যেতি, আর কখনো বা বেহুঁশ হয়ে যেতি। আর আজ তোর এই অবস্থা যে, তুই কিসরার রুমালে থুতু ফেলছিস। তারা দারিদ্রতার মাঝেও ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দানকারী ছিলেন। ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় উপনীত হওয়াকে সহ্য করেছেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দরজা ছেড়ে যাওয়াকে পছন্দ করেন নি। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি প্রাধান্য লাভ করেছিল কারণ হৃদয়ে প্রশান্তি এ থেকেই লাভ হয় আর এই হৃদয়ের প্রশান্তিই তাদের কাছে ঈদে পরিণত হতো। প্রতিটি দিন উদয় হতো তাদেরকে ঈদের শুভ সংবাদ দিয়ে আর এটি জানান দিয়ে যে, তোমাদের জন্য কত কত ঈদ অপেক্ষা করছে।

সুতরাং- ঈদ হলো হৃদয়ের আনন্দ। কেবল নরম মজাদার খাবার খাওয়া, হৈ হুল্লোড় করা, গল্প-গুজব করা প্রকৃত ঈদ নয়। আমাদের খোদাকে সন্তুষ্ট করার মাঝেই হলো প্রকৃত ঈদ। যখন তিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হবেন, যখন আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী হবো, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়কারী হবো, যখন আমরা তাঁর আদেশ-নিষেধের ওপর পূর্ণ আমল করব এবং একে অন্যের অধিকার আদায়কারী হবো, আমরা যখন একে অন্যের জন্য আত্মত্যাগকারী হবো, কেবল স্বার্থপরতা আমাদের উদ্দেশ্য হবে না, আমরা যখন এতীম, গরীব এবং অভাবীদের ব্যাথা নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করে তাদের সাহায্যকারী হবো। এখন তো এতিমদের জন্যও জামাতের ফান্ড রয়েছে, যেখানে লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে দান করছে। বহির্বিশ্বের লোকদের উদ্দেশ্যে আমি পুনরায় বলছি, আপনাদেরও অংশগ্রহণ করা উচিত। এসকল কাজ আমরা কেন করব? এজন্য যে, এর ফলে আমাদের খোদা সন্তুষ্ট হন। এ সমস্ত বিষয়াবলী এ যুগে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন। তিনি (আ.) একস্থানে বলেছেন, খোদা তা'লা এই যুগে একজন সত্যবাদীকে প্রেরণ করে এমন এক জামাত তৈরী করতে চেয়েছেন যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসবে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সাহাবাদের অনুরূপ এক পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী জামাত তৈরী করা।

তিনি (আ.) আরো বলেন, স্মরণ রেখ, ধন-সম্পদ ও পার্থিবতার উন্নত শিখরে পৌঁছা এবং আরাম আয়েশের জীবন কাটানোই এই জামাতের উদ্দেশ্য নয়। এমনটি হলে সেই ব্যক্তির প্রতি খোদা তা'লা অসন্তুষ্ট। তোমাদের উচিত সহাবাদের জীবনকে দেখা। আরো বলেন, লোকদের উচিত প্রতিদিন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবাদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা এবং মনোনিবেশ করা।

তিনি (আ.) আরো বলেন, দুনিয়ার

লোকদের স্বভাব হলো, সামান্য কিছু কষ্টে নিপতিত হলেই দীর্ঘ দোয়া শুরু করে দেয় আর আরাম-আয়েশের সময় খোদাকে ভুলে যায়।

অতএব, আমাদের মাঝে যারা আরাম-আয়েশ এবং স্বাচ্ছ্যন্দে জীবন অতিবাহিত করেন তাদের এই আরাম ও স্বাচ্ছ্যন্দের মাঝে থেকেই সর্বদা আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় রত থাকা উচিত, তাহলেই আমরা ঈদকে স্থায়ী করতে পারব।

তিনি (আ.) বলেছেন, **যে খোদা তালাকে ভয় পায় তার জন্য দুটি জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। যে ব্যক্তি খোদা তালার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে খোদা তা'লা তাকে সুরক্ষিত রাখেন। আল্লাহ তালা তাকে সুরক্ষিতও রাখেন আর সে পবিত্র জীবনও লাভ করে থাকে। তার সকল ইচ্ছা-আকাঙ্কা পূর্ণ হয়।** কিন্তু এটি ঈমান লাভের পরেই অর্জিত হয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, খোদা তা'লার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তো এমন যে, এর কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াদারদের মাঝে পাওয়া যায় না। দুনিয়াদারদের বন্ধুত্বের মাঝে অজুহাত বা বাহানাও থাকে। সামান্য মনোবেদনা বা অসন্তুষ্টিতেই দুনিয়াদাররা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভেঙ্গে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু খোদা তালার সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সাথে বন্ধুত্বের ভিত রচনা করে খোদা তা'লা তার উপর অশেষ কল্যাণ বর্ষণ করেন, তার ঘরে বরকত দান করেন, তার কাপড়ে কল্যাণ দান করেন, তার খাবারের উপর বরকত দান করেন।

অতএব এটিই হলো সেই মানদণ্ড যা হযরত মসীহ মাউদ (আ.) আমাদের কাছ থেকে চান, যেন আমরা তা অর্জন করি। কেবল যেন সাময়িক বা অস্থায়ী আনন্দেই আত্মহারা হয়ে না যাই, অস্থায়ী ঈদেই যেন খুশী না হই। বরং চিরস্থায়ী আনন্দ-খুশী এবং চিরস্থায়ী ঈদকে যেন অন্বেষণ করি। নিজ খোদার সাথে সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী হোন যা কখনও ভাঙ্গবে না। রমযানের কল্যাণসমূহকে প্রতিষ্ঠাকারী হোন এবং আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি যেন সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য পায়। সেই সত্যিকার ঈদ অর্জন করার চেষ্টাকারী হোন যা ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায়, উঠা ও বসা অবস্থায় আল্লাহ তালার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী হবে। যা কিছুক্ষণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই ঈদসমূহ তো প্রদর্শনীর ন্যায় যা সেই প্রদর্শিত পণ্য থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। খোদা তা'লা করুন, আমরা রমযানের দিনসমূহে যে কল্যাণ অর্জন করেছি বা করার চেষ্টা করেছি তা যেন আমাদের মাঝে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের স্থায়ী প্রেরণা সঞ্চারকারী হয়। আল্লাহ তা'লা আমাদের দুর্বলতা সমূহ দূরীভূত করুন। আমাদের দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সাময়িকভাবে দূর করে সাময়িক খুশির কারণ যেন না হয় বরং আমরা যেন স্থায়ীভাবে সুস্থ্যতা অর্জন করি। আমরা যেন আল্লাহ তা'লার অধিকার আদায়কারী হতে পারি। এবং লড়াই-ঝগড়া এবং ফিতনা-ফাসাদকে দূর করে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হতে পারি।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে মুসলিম উম্মতকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন, কেননা তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপকারী। বিশেষভাবে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া দেশগুলোতে ভয়ানক লড়াই-ঝগড়া বিরাজ করছে, এদেশগুলোর অধিবাসীদের স্মরণ রাখবেন। সেখানকার আহমদীরাও ভীষণ সমস্যায় রয়েছে। অনেকের কাছে খাবার-দাবার কিছুই নাই, ঈদ কী উদযাপন করবে! তারা বড় অসহায়। সেখানে খাবার-দাবার পৌঁছানোও ভীষণ কষ্টকর। আহমদীয়াতের কারণে সেখানে কিছু বন্দীও আছে, তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। যাদেরকে আদেশ দেয়া আছে, তোমরা পরস্পরের সাথে প্রেম-ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখ। মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই-ভাই, অথচ তারা একজন আরেকজনের রক্ত-পিপাসু হচ্ছে। অনেক দেশে বিশেষ করে মুসলমান দেশসমূহে, সরকার জনগণকে খুন করছে। আবার জনগণও সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আর এই সুযোগে সুবিধাভোগী ও সন্ত্রাসীরা ফায়দা লুটে নিচ্ছে। এর পিছনে কেবল তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থই থাকে কিন্তু ইসলামের নাম খারাপ হচ্ছে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক বেশী দোয়ার প্রয়োজন। জামাতে আহমদীয়ার সেসব সদস্যদের জন্য দোয়া করুন যারা সমস্যাবলীতে নিমজ্জিত। জামাতের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ওয়াকফে যিন্দেগীদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ তালা যেন তাদের স্বীয় কর্তব্যসমূহ উত্তমভাবে সম্পাদন করার সুযোগ দেন ও সেগুলো যেন গ্রহণও করেন এবং স্বীয় সন্নিধান থেকে এর প্রতিদান দেন। আল্লাহ তা'লা সার্বজনীনভাবে সকলের জীবনের সব সমস্যা দূর করুন, সহজসাধ্য করে তুলুন। আল্লাহ তা'লা সকল আহমদীকে নিরাপদ ও শান্তিতে রাখুন এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাস উত্তরত্তোর বৃদ্ধি করুন যেন আমরা প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে পারি। পাকিস্তানের আহমদীরা কষ্ট-কাঠিণ্যের মাঝে জীবন অতিবাহিত করছে এবং হিন্দুস্তানের কিছু স্থানের আহমদীরাও কষ্ট-কাঠিণ্যের মাঝে রয়েছে। আরব দেশগুলো এবং এমন আরো অনেক দেশে যেখানে আহমদীরা কষ্ট-কাঠিণ্যের মাঝে রয়েছে সবার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তা'লা সবাইকে প্রকৃত ঈদের আনন্দ দান করুন।

আপনারা যারা এখানে সামনে বসে আছেন এবং দুনিয়ার সকল আহমদীকে 'ঈদ মোবারক'।

'খুতবায়ে সানীয়া' পাঠের পর হুযূর (আই.) ইজতেমায়ী দোয়া করান।

ভাষান্তর : **মৌলানা রশীদ আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(১২তম কিস্তি)

সমাজের ঐ সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রথা (Taboo) তাহলে কি? যেমন, সভ্য আচরণ-বিধি, সম্ভ্রম-শালীনতার ধারণা ইত্যাদি, যা কি-না মানুষের স্বভাবজ প্রবৃত্তির অবাধ আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে? তাহলে শুধু যৌন-প্রবৃত্তিটাই কেন এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হবে? কেন সেটাকে অবাধে প্রকাশ করতে বা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে? এবং কেনই বা সেটার প্রকাশের ক্ষেত্রতে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ, প্রথা-ঐতিহ্য, সম্ভ্রম-শালীনতা থাকবে না বা তার প্রয়োগের যথার্থতা বা যথা অধিকার ইত্যাদির কোন বালাই থাকবে না?

আজকাল আমরা যা ঘটতে দেখছি তা এমন প্রকট ব্যাপার যে, তাকে সতর্কতার সঙ্গে আলাদা করে নিয়ে তার বিশ্লেষণ করা দরকার। যাকে আমরা অভিহিত করছি যৌন-সম্পর্কের অনুমোদন যোগ্যতা বলে, তার বহিঃপ্রকাশ এমন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, এতে করে মানবীয় কর্মকান্ডের অন্য সব ক্ষেত্রেই দস্যুবৃত্তি চালানো হচ্ছে, এবং অন্যান্যদেরকেও আঘাত করা হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে; বিকৃত রুচির সুখভোগের অদম্য-বাসনা সেই পতনশীল প্রবণতা থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে, যা আসলে সভ্যতার মহত্তম সৌধকেই ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে এবং জীবনধারাকে সেই বন্য-অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সমাজ কর্তৃক ব্যক্তির ওপরে আরোপিত নানান আচার-আচরণ বিধি-ব্যবস্থা, টাবু (Taboo) বা আদেশ নিষেধের বহুল বৃদ্ধিই শুধু আমরা লক্ষ্য করি না, বরং সেই সঙ্গে আমরা এ-ও লক্ষ্য করি যে, এক্ষেত্রে রোমাল, কোর্টশীপ বা প্রাক-বিবাহ প্রণয় নিবেদনেরও আশ্‌কারা দেয়া হচ্ছে। কবিতা, সাহিত্য, চিত্রকলা, গান-বাজনা, স্টাইল, ফ্যাশন, প্রদর্শনী, সুগন্ধি বা সেন্ট-এর প্রতি আকর্ষণ এবং সুশীল ও সুসভ্য আচরণের অনুশীলন প্রভৃতি, সার্বিকভাবে না হলেও অনেকাংশে সেই একই মৌলিক-প্রবৃত্তিরই প্রকাশ, যা আচরিত হচ্ছে সামাজিক আচরণেরই আকারে।

এমন একটা সময় আসতে পারে যখন ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম বিদ্রোহ করবে এবং হাজার বছরের অর্জিত সব সামাজিক প্রগতিকে প্রত্যাখ্যান করে বসবে। অবশ্য সেই বিদ্রোহ যে সমস্ত কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করবে, তেমন না-ও হতে পারে। তবু 'হিপ্পীজম, বোহেমিয়ানিজম (বাউণ্ডুলেপনা), স্যাডিজম বা লম্পট আচরণ, পশুসুলভ ও বন্য ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি হচ্ছে উল্লিখিত প্রবণতার মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত।

যে কেউ তার সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখতে পাবে যে, সেখানে দ্রোহী ও তরবিয়ৎহীন যুবকদের একটা দল বিচরণ করছে, এবং এতে করে সে বুঝতে পারবে যে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কী সব ঘটে চলেছে। মনে হবে, যেন পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধির স্থলে ময়লা আর দুর্গন্ধই জায়গা করে নিয়েছে। পাক-সাফ লেবাসের জায়গা দখল করে নিয়েছে নোংরা-নাপাক আর স্বেচ্ছায় অসতর্কভাবে পরিহিত পরিচ্ছদ। সেই দিন আর নেই, যখন কারো পোষাক-আশাকের প্রতি এক নজর তাকালেই ভীষণ একটা বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হতো। ছেঁড়া-ফাড়া জিন্‌স, বিশেষ করে দেহের নিম্নভাগের কিছু কিছু অংশ দেখা যায় এমনভাবে ছেঁড়া জীন্‌স, এখন একজোড়া নতুন প্যান্ট পাজামার চাইতে বেশী দামী। অবশ্য সমাজের গোটাটাই যে অতীতের সব ঐতিহ্যের প্রতি অনুরূপভাবে দারুণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, তা নয়। তবে, দেহের ভিতরে যখন কোন ব্যাধির সৃষ্টি হয়, তখন গোটা দেহটাই যে ক্ষতে ক্ষতে ছেয়ে যায়, এমনতো নয়।

বরং দেহের এখানে সেখানে দু'চারটা ক্ষত দেখা দেয়, এতে করেই বুঝা যায় যে, গোটা দেহটাই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সমাজ দেহে এমনটি হলে তখন দায়িত্বহীনতা বাড়তে থাকে। বিশৃংখলা এবং অনিয়ম তখন একটা নিয়মে পরিণত হয়। তখন সমাজের এবং মানবীয় স্বার্থের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা দৃশ্যমান হতে থাকে।

সুখের অন্বেষায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আরও অধিক অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজন হয় পরিবর্তনের এবং নতুনত্বের। অতীতে সুখলাভের জন্য যে সকল সামগ্রী ব্যবহৃত হতো এখন সেগুলো আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। ধুমপান এবং প্রাচীন কালের প্রচলিত মাদক দ্রব্যাদি এখন আর ক্রমবর্ধমান অস্থির সমাজের চাহিদা মেটাতে পারছে না। এখন সব ধরনেরই মাদক বা ড্রাগ পাওয়া যাচ্ছে। এখন মাদকাসক্তির বিস্তার রোধের সকল ব্যবস্থাই অপ্রতুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন আরও তীব্র মাদকের। তাই উৎপাদিত হচ্ছে ক্র্যাক (Crack)-এর মত শক্তিশালী, তীব্র নেশাকর ও মারাত্মক ড্রাগ।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বর্তমান শতাব্দীর গত কয়েক দশক ধরে বিগত কয়েক শতাব্দীর সঙ্গীতের উন্নতির সঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর গত কয়েক দশকের গান বাজনার ক্ষিপ্রতা এবং শব্দের তীব্রতার মানের বিস্ফোরিত পরিবর্তনের তুলনা করলে অনেক মজার মজার এবং কৌতুহলোদ্দীপক উপাত্ত পাওয়া যাবে।

সংগীত বিষয়ে আমার খুব একটা জানা-শোনা নেই। কাজেই, এ সম্পর্কে আমি যদি এমন কিছু বলে ফেলি, যা কি-না সঙ্গীতের জগতের সাথে তেমন একটা সম্পর্কিত নয়, তাহলে যেন আমাকে ক্ষমা করা হয়। তবে, আমার বোধ আমাকে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে যে, পাশ্চাত্য জগতে বিগত কয়েক শতাব্দীতে সঙ্গীতের যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তার যাত্রা ছিল উৎকর্ষ, নির্মল আনন্দ ও মহত্বের দিকে। সেই সঙ্গীত যুগপৎ মানব-মনে ও মানব-হৃদয়ে শান্তি আনতে পারতো। সর্বোত্তম সঙ্গীত ছিল সেটাই, যা মানব-চিত্তে ও মানব-হৃদয়ের মধ্যে নিহিত সুপ্ত যে সঙ্গীত, তাকে সনাক্ত করতো এবং তারাই ভেতরে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে যেত। সুর-সঙ্গতি এবং শান্তিই ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য, যার প্রতি ছিল সঙ্গীতের বিবর্তন। বড় বড় গীতিকার ও শিল্পীদের রচনায় এমন অনেক অংশ থাকতো, যা অগ্নিগিরির উদ্গীরণ, প্রচণ্ড তুফান এবং বজ্রপাত সংঘটিত হওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারতো এবং তা অনুভূতির জগতে এরূপ আবেদন ও আলোড়ন সৃষ্টি করতো, যার উপমা কেবল প্রকৃতির বুকে সংগটিত ঐসব ঘটনাবলীই। এ সবের স্মৃতি অনপনেয়-রূপে জমাকৃত ও সংরক্ষিত থাকতো জীবনের স্মৃতি-যন্ত্রের অভ্যন্তরে। সময়ে সময়ে যেই সঙ্গীতের ক্লাইমেক্স সুর-লহরীর এমন উচ্চমানে পৌঁছে যেত যে, মনে হতো যেন সমগ্র বিশ্বজগতটাই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তথাপি, মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতারা স্থির নিশ্চিল হয়ে বসে থাকতো, সংগীতের মহাবন্যায় তলিয়ে যেত। তারা নিস্পলক নেত্রে নিস্তব্ধ হয়ে থাকতো, যতক্ষণ না সহসা সেই পিন-পতন নীরবতায় ছেদ পড়তো। এবং তখনই, কেবল তখনই, সারাটা হলঘর প্রচণ্ড করতালি আর উল্লাসে ফেটে পড়তো। কোনও তীব্র ভাবাবেগ তাড়িত অত্যন্ত শক্তিশালী সঙ্গীতও শ্রোতাদেরকে কখনই উন্মত্ত, উগ্র বা বিদ্রোহাত্মক করে তুলতো না। সকল সঙ্গীতেরই বাণী ছিল মহৎ, শান্তিময় ও সুসঙ্গত। তাতে মানুষের মধ্যকার চরম উৎকর্ষতাই বিকশিত হতো, জাগ্রত হতো, আর অপসৃত হতো তার চরম সব অপকর্ষতা।

আফসোস! বিগত কয়েক দশক ধরে আমরা যা দেখছি, তা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। সমসাময়িক প্রজন্মের কানগুলো বধির করে দেওয়া হচ্ছে ,এমন সব গান বাদ্যের দ্বারা, যা পারে শুধু জীবনের আদিম ও অশীলিত প্রবৃত্তিগুলোকেই জাগ্রত করতে। উচ্ছৃঙ্খল ও অস্থির একটা প্রজন্মের কানে তো কেবল সেই সংগীতকেই সুসঙ্গত ও সুখকর মনে হয় যা তাদেরকে মাতাল করে তুলতে পারে। সেই সঙ্গীত যত উগ্র ও প্রচণ্ড হয় ততই জনপ্রিয় হয়। ক্লাসিক্যাল ও পপুলার মিউজিক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার দরুন কোন মন্তব্য করা হয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত যে, এটাই হচ্ছে সেই উগ্রতা, প্রচণ্ডতা, দ্রোহ এবং উন্মত্ততা, এবং সৌন্দর্য-বিধ্বংসী অসুন্দর যা অতি দ্রুত মহৎ মানবীয় গুণাবলীর ধ্বংস সাধন করছে।

প্রফেসর ব্লুম (Prof. Bloom) যিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কে একজন জানাশোনা ব্যক্তি, তিনি মনে হয় এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে ঐকমত্যই পোষণ করেন। তিনি তাঁর, 'দি ক্লোজিং অব দি এ্যামেরিকান মাইন্ডস্ (The Closing of the American Minds) পুস্তকে সমসাময়িক যুগের কিশোর ও তরুণদের মনের সংবেদনশীল অনুভূতিসমূহের অবক্ষয়ের জন্য বিলাপ করেছেন। বলেছেন যে, এই কিশোর ও তরুণরা অনবরত রক সঙ্গীতের (Rock Music) প্রভাবাধীনে থাকার দরুন পশুতে পরিণত হচ্ছে। এ জাতীয় সঙ্গীতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, এগুলো আত্মার জন্য নেশাযুক্ত নোংরা খাদ্য।

সমাজের এই রুগ্ন-অবস্থার নানাবিধ প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট উপসর্গ ফুটে বেরুচ্ছে, এবং তা ক্রমাগতভাবে মানবজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে, যার দরুন মানুষের স্বস্তি, শান্তি তৃপ্তি, নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষ তো খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও করতে পারে। কিন্তু সে তো সর্বশক্তিধর (Nature) অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। এবং এই প্রকৃতি তো এটা ভালোভাবেই জানে যে, কী করে তার বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের শাস্তি দিতে হয়। সকল বস্তুবাদী সমাজে অশুভ (Evil) ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এর জন্য দায়ী প্রধান যে উপকরণটি, তা-ও ঐ একই। এ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে আমরা শুধু তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য সংক্ষেপে উল্লেখ করছিঃ

(ক) ক্রমবর্ধমান নাস্তিকতা;

(খ) এক সত্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি মানুষের সব কর্মকাণ্ডে এবং তাদের চরিত্র

গঠনের ক্ষেত্রে জীবন্ত ও কার্যকর প্রভাব বিস্তার করেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষয়িষ্ণুতা;

(গ) ঐতিহ্য ও নীতি-শাস্ত্রগত মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস ক্রমতাভাবে দুর্বল হয়ে পড়া; এবং

(ঘ) লক্ষ্যকে ভুলে যাওয়ার বর্ধিষ্ণু প্রবণতা এবং খোদ পন্থাকেই (Means) লক্ষ্য বলে নির্ণয় করা।

এই-ই তো হচ্ছে পরিস্থিতি, যা বিরাজ করছে পৃথিবীর তথাকথিত 'সভ্য' এবং 'উন্নত' সমাজগুলোতে। ধীরে ধীরে, নৈতিক ও নীতিশাস্ত্রের (Moral and Ethical) মূল্যবোধগুলি তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাবও বিস্তারিত হয়ে পড়ছে সরকারগুলোর আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের ওপরে। গ্রাহ্য হওয়ার মত খোদা-প্রদত্ত কোন আইন (ব্যবস্থা বা শরয়িত) যখন আর নেই (তাদের সামনে)), এবং যখন নিরংকুশ নীতিশাস্ত্রের মূল্যবোধও নেই, এবং মহান ঐতিহ্যকেও যখন প্রত্যহ চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে এবং অমান্য করা হচ্ছে, তখন নৈতিক আচরণকে সুশৃংখল করার আইন প্রণয়নও হয়ে পড়ছে শিথিল ও যথেচ্ছ সম্প্রাসারণশীল। এমতাবস্থায়, যে পটভূমিতে নৈতিক-আচরণ সংক্রান্ত আইন-কানুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়, সেটাই স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

এই বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হবে যদি এ ব্যাপারে বিগত কয়েক শতকের আইন প্রণয়নের তুলনামূলক গবেষণা করা যায়। অস্কার ওয়াইল্ডের (Oscar Wilde) দিন এখন গত হয়ে গেছে, যখন সমমৈথুন সমাজে একটা পাপ বলে বিবেচিত হতো, এবং সমাজ সেজন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করতো। সেদিনও আর নেই, যখন সতীত্ব শুধু একটি মহা নৈতিক-গুণ হিসেবেই গন্য হতো না, বরং তা বিবেচিত হতো সামাজিক ট্রাষ্ট বা আমানত হিসেবে, যার খেয়ানত করা হলে বিচারের সম্মুখীন হতে হতো। এখন অপরাধের প্রতি নমনীয়তা আর বিপদ-সংকেতরূপে বিবেচিত হচ্ছে না। আর এটাই হচ্ছে সমস্যা।

অপরাধের সংজ্ঞাই এখন মৌলিক পরিবর্তনের কবলে পড়েছে। গতকালও যা অপরাধ বলে বিবেচিত হতো, আজ আ তা হচ্ছে না। লজ্জার কারণে বা তিরস্কারের ভয়ে যা গোপন রাখা হতো, এখন তা প্রকাশ করা হচ্ছে, প্রদর্শিত হচ্ছে বেশ গর্বের সাথেই। এই দর্শনটাই যদি সঠিক হয় এবং উত্তরণের উপযোগী হয়, তাহলে সমস্ত ধর্মীয়, নীতি-শাস্ত্রীয় ও নৈতিক-দর্শন অচল ও অবাঞ্ছিত হয়ে যাবে। সেগুলো এখন আর হাল-যামানার কোনও কাজে আসবে না।

প্রকৃতির মধ্যকার চালিকা-শক্তি, জড় এবং প্রাণী, উভয় জগতেই অভিন্ন। এবং সেটাই হচ্ছে অপরাধ ও শাস্তির এবং সদগুণ ও পুরস্কারের মূলনীতি, যা সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। এই মূলনীতি জড়-জগতে ক্রিয়াশীল দেখা যাবে প্রকৃতির নিয়মাবলীর অচেতন কার্যকারিতায়। একই মূলনীতিতে প্রাণী-জগতেও মানবসৃষ্টির পূর্বেকার বিবর্তন চালিত হয়েছিল, যা প্রাপ্ত হয়েছিল একটা অর্ধ-চেতন বা অর্ধ-সুপ্ত অবস্থা। কেউ যদি মানব সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত বিবর্তনের স্তরগুলোর নিম্নতম ধাপগুলো থেকে পরিভ্রমণ করে আসে, তাহলে তার এই ভ্রমণ হবে স্বল্প-চৈতন্য থেকে অধিক-চৈতন্যের দিকে। বিবর্তনের ভাষায়, অপরাধ ও শাস্তি এবং সদগুণ ও পুরস্কারের এই মূলনীতিকেউ বলা হয়েছে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'। বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে এটাই হচ্ছে চালিকা শক্তি ও গতি-শক্তি, যা বিবর্তনের ধারাকে ক্রমাগতভাবে ঠেলে দিচ্ছে সম্মুখে এবং উর্ধ্বে।

এটা বুঝে উঠা তো অসম্ভব যে, এই প্রক্রিয়াটা যখন সর্বোত্তম সৃষ্টি যে মানুষ তার মধ্যে এসে চরমত্বে পৌঁছে গেল, এবং যখন চৈতন্য এমন সব দিগন্তে উত্তীর্ণ হলো যা মানবেতর সমস্ত কাল্পনিক শক্তির যাবতীয় দুর্বার কল্পনাকেও অতিক্রম করে গেল, ঠিক তখনই সহসাই অপরাধ ও শাস্তির সেই মূলণীতিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো এবং তা অচল করে দেওয়া হলো। সৃষ্টির যদি কোন উচ্চতর লক্ষ্য থেকেই থাকে, তাহলে তার কিছুটা জবাবদিহিতা থাকতেই হবে, নইলে তো গোটা ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে, বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা এবং ভাবুকরাও এই সুস্পষ্ট ও স্ব-প্রকাশিত সত্যটাকে দেখতে পান না। এবং বিষয়টা আপেক্ষিক তত্ত্বের আবিষ্কারক আলবার্ট আইনষ্টেইনের কাছেও একইরূপ। তাঁর কথায়ঃ

'আমি এমন এক খোদার কথা কল্পনাও করতে পারি না, যিনি তাঁর নিজস্ব সৃষ্ট বস্তুকে পুরস্কৃত করেন এবং শাস্তি দান করেন, যাঁর উদ্দেশ্য কি-না আমাদেরই উদ্দেশ্যের মডেলে গঠি, -একজন খোদা, যিুনি আছেন তো বটে, কিন্তু তিনি, এক কথায়, মানবীয়-দুর্বলতারই একটা কল্পনা মাত্র।' (আলবার্ট আইনষ্টোইন)।

যদি প্রভু ও স্রষ্টা এক খোদা থেকেই থাকেন, যাঁর অস্তিত্ব আলবার্ট আইনষ্টেইনও অস্বীকার করতে পারবেন না, এবং যদি সকল বৈজ্ঞানিক-নিয়ামাবলী, যা সৃষ্টির মধ্যে কার্যকর রয়েছে, তা সবই পরিকল্পিত হয়, সৃষ্ট হয় এবং নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সেই একই সর্বোচ্চ সত্তা (Sprime Being) কর্তৃক, তাহলে এটা তো তাঁর (খোদার) তরফে ধারণা করাও সম্ভব নয় যে, তিনি অপরাধ ও শাস্তির নীতি প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁর সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকেই পরিত্যাগ করেছেন, এবং মানুষকে ছেড়ে দিয়েছেন নিয়মশৃংখলাহীন ও জবাবদিহি-হীন আচরণের এক বিশৃংখলার মধ্যে।

তাঁর (আইনষ্টেইন) মন্তব্যের অপর অংশ সম্পর্কে বলতে হয় যে, এটা পরিষ্কার যে, তিনি শুধু সৃষ্টির প্রগতিশীল উন্নতির পথে অপরাধ ও শাস্তির ভূমিকা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হননি, বরং যে 'মানুষ সৃষ্টি হয়েছে খোদার প্রতিবিম্বরূপে', 'তিনি সেই মানুষের অর্থও সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন।

মানুষ যদিও সৃষ্টি হয়েছে খোদার প্রতিবিম্ব-রূপে, তথাপি সে পৃথিবীর বুকে খোদার পরিপূর্ণ বা পারফেক্ট মডেল হিসেবে সৃষ্টি হয় নি। তা-ই যদি হতো, তাহলে দুনিয়াটা বেহেশ্‌তের চাইতেও সুন্দরহতো, এবং সকল মানুষ হুবহু একই রকম হতো। অবশ্য, এটা একটা বিতর্কযোগ্য বিষয় যে, তেমনি একটা স্থানকে আদৌ বেহেশ্‌ত বলা যাবে কি-না, অথবা তা একটা একঘেঁয়েমীপূর্ণ স্থান হবে কি না। কেননা,

তেমনটা হলে সেখানে থাকবে না কোনও বৈচিত্র্য, কোনও পরিবর্তন, অথবা গোত্র, বর্ণ, প্রভৃতির কোনও পার্থক্য। পরিবর্তে, সেটা হয়ে পড়বে একটা প্রশান্ত ও অসংখ্য-অগণিত একই শ্রেণীর বর্ণনাহীন বিন্দুসমষ্টির সমুদ্র। এটা তো মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে– খোদা তা'লার প্রতিবিম্বরূপে, সে তো 'Created in the image of God.'এই শব্দগুচ্ছ বা ফ্রেজটি Phrase গভীর জ্ঞান-সমৃদ্ধ এবং এর মধ্যে মানুষকে যে সম্ভবনাময় ক্ষমতা দান করা হযেছে, তারই কথা বলা হয়েছে। এতে সেই চূড়ান্ত লক্ষের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অর্জন করার জন্য মানুষকে অবশ্যই প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্য ঠিক ততটাই পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত হতে হবে, যতটা মানুষের পক্ষে হওয়া সম্ভব এবং তা সম্ভব কেবল খোদায়ী গুণাবলী অর্জন করে, খোদার মত হয়ে ওঠার মাধ্যমে। এটা কোন একটা নির্দিষ্ট স্থির লক্ষ্য নয়, যেখানে কেউ পৌঁছে গিয়ে এই গৌরবে আনন্দ ভোগ করতে থাকবে যে, সে তো খোদার প্রতিবিম্ব হয়েই গেছে, আর না, ব্যস্ হয়ে গেছে। খোদা যেমন অসীম অথবা তিনি যেমন তাঁর গুণাবলীতে সীমাহীন, তেমনি তাঁর দিকের প্রত্যেকটি সফরও সীমাহীন। এক্ষেত্রে, পূর্ণতার অর্থ হচ্ছে নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় ক্রমাগত ভাবে উত্তীর্ণ হতে থাকা।

আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও পবিত্র, সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ, সর্বাপেক্ষা দয়াশীল, চির-কৃপাময়, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, প্রভু-স্রষ্টা এবং বিচার দিবসের মালিক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

'তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত; তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই; যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তা দাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান। তারা যা শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। তিনি আল্লাহ্, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আদি-সুনিপুণ স্রষ্টা, সর্বোত্তম আকৃতি দাতা। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেই তাঁর গুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে, এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।" (আল্ হাশর-৫৯ঃ ২৩-২৫)

এই-ই তো হচ্ছেন সেই খোদা, যিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি কখনই মানবীয় দুর্বলতার শিকার হন না। পবিত্র কুরআন বার বার বিশ্বাসীদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেঃ

"পরম বরকত ও কল্যাণময় তিনি, যাঁর হাতে সকল আধিপত্য, এবং তিনিই সব কিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান; যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন– তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী অতীব ক্ষমাশীল; যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাও?

অতঃপর তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধকর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে তোমার নিকটেই ফিরে আসবে এমতাবস্থায় যে, তা অতি শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়বে (তবু কোন প্রকার অসামাঞ্জস্য দেখতে পাবে না)"। (আল মূলক-৬৭ঃ২-৫)

'খোদার প্রতিবিম্ব'- কথাটির তাৎপর্য অনুধাবন করার পর কেউ যদি বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সমস্ত বলের (Forces) প্রতি তার দৃষ্টি ফেরায়– সেই 'বিগ ব্যাঙ' (Big Bang)-এর সময় থেকে নিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত, তাহলে সে দেখতে পাবে যে, অচেতন থেকে সচেতন পর্যন্ত সৃষ্টির সারাটা ভ্রমণই হচ্ছে, বস্তুতঃ খোদার প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠারই ভ্রমণ এবং মানুষের মধ্যে খোদায়ী-গুণাবলীর ক্রমবিকাশ সাধন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে প্রণীত পুস্তক থেকে)

(চলবে)

ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। পবিত্র ঈদুল ফিতর সকলের জন্য বয়ে আনুক অশেষ কল্যাণ ও বরকত।

–সম্পাদক

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পবিত্র রমযান মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলনের মাধ্যমে খোদা-মিলনের স্বাদে পরিতৃপ্ত করে

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা পবিত্র রমযান অতিবাহিত করছি। মহানবী (সা.)-এর এক উক্তি অনুসারে আমরা এ মাসে ক্রমান্বয়ে খোদা তা'লার রহমত ও মাগফিরাতের দশক অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের আশারা বা দশকও পেয়ে যাব ইনশা-আল্লাহ্। (আল জামে' লেশু'বিল ঈমান, কিতাবুস সিয়াম, বাব ফাযায়েলু শাহরে রামাযানা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৪, হাদীস নম্বর: ৩৩৩৬)

খোদা তা'লার একান্ত অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর থেকে, পাঁচ বেলার নামায আদায় করে,পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে, তারাবীহ পড়ে,আল্লাহর পথে খরচ করে,সদকা-খয়রাত করে ফিতরানা দিয়ে এবং সাহরীর পূর্বে নফল আদায়ের মাধ্যমে রমযানের মহান কল্যাণসমূহ লাভের সৌভাগ্য দান করেছেন। তবে এক মু'মিন, যে খোদার সত্তায় বিশ্বাস রাখে এবং তাক্বওয়া অবলম্বনের চেষ্টা করে, খোদা-ভীতিতে যার হৃদয় পরিপূর্ণ থাকে, সে শুধু এতেই আনন্দিত হতে পারে না যে, এদিনগুলো অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মুক্তিলাভের সুযোগ দিয়েছেন। এদিনগুলো নিঃসন্দেহে রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ দিনগুলোর কল্যাণরাজি লাভ করার উপায়, সত্যিকার অর্থে আমরা কি জানি? আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)এর আদেশ-নিষেধ বা উক্তি নিঃশর্ত হয় না। বরং, এগুলো কিছু শর্তসাপেক্ষ। অতএব, এদিনগুলোতে আল্লাহ তা'লার রহমত আর মাগফিরাত বা ক্ষমা থেকে অংশ পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্যও কিছু শর্ত মেনে চলা আবশ্যক হয়ে থাকে।

রহমতের দশক : কল্যাণ লাভের পথ দেখায়

রমযানের প্রথম দশক রহমতের। এ দশক থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আমাদের সেসব বিষয় সন্ধান করতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর ফযল এবং কৃপারাজিতে ধন্য হতে পারি। খোদা তা'লার দু'প্রকারের রহমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম প্রকার রহমত বা করুণা খোদার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ হয়ে থাকে। তা অর্জনের জন্য মানুষ বিশেষ কোন চেষ্টা-সাধনা করে না। যেমন- আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **ওয়া রাহ্‌মাতী ওয়া সি'আত্ কুল্লা শাইয়্যিন** (সূরা আল্-আ'রাফ: ১৫৭) অর্থাৎ, আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আল্লাহ্ তা'লার এই রহমত হতে সকল মানুষ নির্বিশেষে সমগ্র সৃষ্টিকুল অংশ লাভ করছে। কোন প্রকার সৎকর্ম ব্যতিরেকেই তারা সেই রহমতের ভাগী হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টি এভাবে বলেছেন:

"এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, রহমত ব্যাপক এবং সার্বজনীন অপরদিকে আল্লাহ্‌র ক্রোধ অর্থাৎ 'আদ্‌ল' (অন্যায়ের যথাযথ শাস্তি দেয়া) বিশেষ কোন কারণে নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ ঐশী আইন লঙ্ঘনের ফলে এই বৈশিষ্ট্য কার্যকর হয়। এজন্য প্রথমতঃ ঐশী আইন বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর সেই ঐশী-আইন লঙ্ঘনের ফলে পাপ সংঘটিত হয় আর এরপরই খোদার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং স্বীয় দাবী পূরণ করতে চায়।" (জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২০৭)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং দয়া প্রদর্শন করেন। ছোট-খাটো ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ্ তা'লা তো হর-হামেশা ক্ষমা করতেই থাকেন, কিন্তু ঐশী আইনের সীমা চরমভাবে লঙ্ঘন করায় মানুষ গযব বা শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়, তখন খোদা তা'লার 'আদ্‌ল' বা ন্যায় বিচার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, স্বীয়-রূপ প্রকাশ করে। কিন্তু সার্বজনীনভাবে খোদা তা'লার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অনেক সময় আদ্‌ল বা ঐশী-বিধান লঙ্ঘনের ফলাফল স্বরূপ শাস্তি পাওয়া আবিশ্যক হয়ে থাকে। কিন্তু তাসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা

করুণাবশতঃ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এই অবস্থা মু'মিনদের সাজে না। প্রকৃত মু'মিনদের অবস্থান এবং মর্যাদা ভিন হয়ে থাকে।

ঈমানের দাবী হল, ঈমানী অবস্থাকে শোধরানো এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানবিক কোন দুর্বলতার কারণে কোন পাপ যদি হয়েই যায়, তাহলে খোদা তা'লার রহমত এবং করুণা সেই পাপকে ঢেকে রাখে। তবে অনেক সময় মানুষ পাপে লাগামহীন হয়ে যায়, আর একথা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমতের সাগর অতি বিস্তৃত, তাই চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে, এমন মন-মানসিকতা খোদা তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানানোরই শামিল।"

খোদা তা'লার রহমত বা করুণা তাঁর ক্রোধকে ঢেকে রাখে বা পরিবেষ্টন করে, এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন:

"সর্তকবাণীতে আসলে কোন প্রতিশ্রুতি না থাকলেও যা থাকে, তাহলো খোদা তা'লা স্বীয় 'কুদ্দূসিয়্যত' বা পবিত্রতার কারণে অপরাধীকে শাস্তি দিতে চান। আর কখনো কখনো এই নিরিখে নিজ ইলহামপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিতও করেন। এরপর অপরাধী ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে তওবা, ইস্তেগফার, আহাজারী ও আকুতি-মিনতির মাধ্যমে যথাযথভাবে অনুশোচনার দাবি যখন পূরণ কওে, তখন খোদার করুণার দাবী তাঁর গযব বা ক্রোধের দাবীর ওপর প্রাধান্য লাভ করে।

অতএব ঐশী রহমতের দাবি, শাস্তি বা ক্রোধের দাবির ওপর ছেয়ে যায় আর সেই গযব বা ক্রোধকে নিজের মাঝে লুকিয়ে ফেলে বা প্রচ্ছন্ন করে। পবিত্র কুরআনের আয়াত- **আ'যাবী উসীবু বিহী মান আশাউ ওয়া রাহ্‌মাতী ওয়া সি'আত্ কুল্লা শাইয়্যিন** (সূরা আল্-আ'রাফ: ১৫৭) এর অর্থ এটিই অর্থাৎ **রাহমাতী সাবাক্বাত গাযবী**।" (তোহফায়ে গযনবীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃ: ৫৩৭)

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর ছেয়ে রয়েছে। অতএব, তওবা ও ইস্তেগফারের কারণে আল্লাহ্ তা'লা পাপীদেরকেও ক্ষমা করে দেন এবং যারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যায় তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেন।

মু'মিনদের ক্ষেত্রে রহমত বা করুণা লাভ, কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। আর তাকওয়ার পথে বিচরণকারী সৎকর্মশীলদের সাথে এর প্রতিশ্রুতি শর্তযুক্ত। যেমন- আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **ইন্না রাহ্‌মাতাল্লাহি ক্বারীবুন মিনাল মুহ্‌সিনীন** (সূরা আল্-আ'রাফ: ৫৭) অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার রহমত মুহসিন বা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী বা সাথে আছে।

'মুহসিন' শব্দের অর্থ হলো এমন ব্যক্তি, যে অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাকওয়ার পথে বিচরণকারী, জ্ঞানী, সকল শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কাজসমূহ সমাপনকারী। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, খোদার রহমত তাদের সাথে রয়েছে যারা জেনেশুনে পাপ করে না, নিজেদের পাপের শাস্তির ভয়ে সর্বদা তাঁকে যারা ডাকে আর অন্তরে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে। তারা এমন মানুষ, যারা জেনেবুঝে পাপ থেকে বিরত থাকে, বরং নিজের অজান্তে কোন পাপ হয়ে গেলেও তাকওয়ার সাথে তারা খোদা তা'লার স্মরণাপন্ন হয়। তখন খোদা তা'লার রহমত তাদের ওপর বর্ষিত হয় এবং তাদের দোয়া গৃহীত হয়।

এটি খোদা তা'লার এক বিশেষ কৃপা বা রহমত যে, তিনি দোয়া গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে কোন জোর খাটে না আর না কেউ এই বলে জোর খাটাতে পারে যে, অবশ্য অবশ্যই তিনি আমাদের দোয়া গ্রহণ করবেন। তাঁর দয়া এবং করুণা মুহ্‌সেনদের সাথে রয়েছে, আর এই দয়া ও করুনা তাদের প্রতি নাযিল হয়, যারা তাকওয়ার সাথে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে, আর অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তাদের প্রাপ্য-অধিকারও দিয়ে দেয়।

অতএব, গৃহীত মানের দোয়াপ্রার্থী হতে হলে মুহ্‌সিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক আর 'মুহ্‌সিন' শব্দের এই সকল অর্থ সামনে রেখেই মুহসিন বা সৎকর্মশীল হতে হবে। সাধারণ বা তুচ্ছ সৎকর্ম করে মানুষ মুহসিন হতে পারে না। বরং এই মর্যাদায় উপনীত হওয়ার জন্য নিজেদের সৎকর্মকে উন্নত মানে পৌঁছানো আবশ্যক। মহানবী (সা.) মুহসিনের যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন সেটি যদি মানুষ দেখে, তাহলে মানুষের হৃদয় ভয়ে কেঁপে উঠে যে, আমাদের ইবাদতের অবস্থা কি এই মানের? আমরা যে কাজই করি প্রতিটি কাজের সময় আমাদের অবস্থা কি এমনই হয়, যেরূপ মহানবী (সা.) বলেছেন। আর সেই অবস্থা কি?

মহানবী (সা.) বলেছেন, মুহসিন হলো সে, যে প্রতিটি সৎকর্মের সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, সে আল্লাহ্ তা'লাকে দেখছে। একথা তার দৃষ্টিতে রাখা চাই বা অন্ততঃপক্ষে এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে দেখছেন। [সহীহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান, বাব সাওয়ালু জিবরীলান নাবীয়া (সা.) আনিল ঈমানে ওয়াল ইসলামে ওয়াল ইহসানে, ওয়া ইলমিস সাআতে, হাদীস নম্বর: ৫০]

আমাদের ইবাদতের মান যদি এমন হয় আর অন্যান্য কাজ করার সময়ও যদি অবস্থা এমন হয়, তাহলে অন্যায় কাজ কখনো হতেই পারে না। আমরা কখনও তাক্ওয়া থেকে বিচ্যুত হতেই পারি না, কখনো কারো সাথে মন্দ আচরণ করতেই পারি না, কখনো কারো অধিকার খর্ব করতেই পারি না। বরং কারো ক্ষতি করা বা অধিকার পদদলিত করার কথা ভাবতেও পারি না।

আমরা একথায় উৎফুল্ল হয়ে উঠি যে, খোদা তা'লার রহমতের দশক আমরা অতিবাহিত করেছি, কিন্তু আমরা ভাবি না

যে, এই রহমত লাভের জন্য আমরা কী করেছি বা আমাদের কী করা উচিত ছিল। আমরা কি সেসব পাপী এবং অপরাধীর মতই সময় অতিবাহিত করেছি, যারা সাময়িক আহাজারি করে খোদার রহমত লাভ করে সেই শাস্তি এড়াতে পেরেছে, যা কারো কোন বিশেষ অপরাধ বা কতক অপরাধের কারণে নির্ধারিত ছিল? নাকি আমরা মুহসেনীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের জীবনকে সেভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করছি, যারা তাকওয়ার ওপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার করে, যারা অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহারের স্থায়ী অঙ্গীকার করে, যারা রমযানকে নিজেদের মাঝে পবিত্র-পরিবর্তন আনয়নের স্থায়ী মাধ্যমে পরিণত করার চেষ্টা করে এবং পরিণত করে?

অতএব, এই রহমত এবং করুণাবারি আকর্ষণের চেষ্টা আমাদের করা প্রয়োজন এবং করা উচিত, যা আমাদের স্থায়ী-সঙ্গী হবে। সাময়িকভাবে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে, সময় কেটে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব; এমনটি যেন না হয়। এই একটি মাত্র শব্দ 'রহমত'-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.) আমাদের জীবনের জন্য কর্মপন্থার এক ভান্ডার রেখে গেছেন, আর তা হচ্ছে- রমযানের প্রথম দশ দিনে তোমরা এই রহমত সন্ধান কর আর এই রহমত যখন লাভ হয় তখন এই অঙ্গীকার কর যে, একে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেবে। এই দশ দিনের তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণ এক মু'মিনকে পরবর্তী পথ দেখাবে।

মাগফিরাতের দশক: মু'মিনকে সৎকর্মে একনিষ্ঠ করে গড়ে তুলে

শয়তান যেহেতু প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের পিছু ধাওয়া করছে, সে নিজের কাজে সদা ব্যস্ত, বিভ্রান্ত করার কাজে রত, পুণ্য থেকে বিচ্যুত করার কাজে নিয়োজিত, তাই এই রহমত বা করুণা লাভের পর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য খোদার সাহায্যের প্রয়োজন। আর এই সাহায্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে কোন্ রীতি অবলম্বন করতে হবে? বলা হয়েছে, এরপর পরের দশ দিন খোদার সাহায্য এবং শক্তি যাচনা কর, যেন তোমাদের কর্ম স্থায়ীকর্মে রূপ নেয় আর সেই শক্তি হলো, ইস্তেগফার।

তিনি(সা.) বলেছেন, দ্বিতীয় দশক হলো মাগফিরাতের দশক। যেমন বলা হয়েছে, আহাজারি বা আকুতি মিনতিকারীর পাপ ক্ষমা করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় ক্ষমা বা মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করেন এবং তাদের ওপর কৃপাবারি বর্ষণ করেন। কিন্তু মু'মিন তাঁর সাত্তারীপূর্ণ এই রহমতকে যেন জীবনের অংশরূপে অঙ্গীভূত করে নেয়, যার বহির্প্রকাশ তাদের ইবাদতের মাধ্যমেও হয় এবং অন্যান্য কর্মের মাধ্যমেও আর ইস্তেগফার স্থায়ী হয় নিজেদের কর্মের ওপর দৃষ্টি রাখলে। আর যখন এমন হবে, তখন খোদার মাগফিরাত বা ক্ষমা আমাদেরকে পরিবেষ্টন করবে, তাঁর রহমতের দ্বার আমাদের জন্য ক্রমাগতভাবে উন্মোচিত হতে থাকবে। আর যখন এমন হবে, তখন পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিকও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ক্রমাগতভাবে দিতে থাকবেন।

ইস্তেগফারের প্রকৃত মর্ম

এক মু'মিনের জন্য মাগফিরাতের প্রকৃত মর্ম বা তত্ত্ব কী আর এটি লাভের উপায় কী আর কীভাবে ইস্তেগফার করা উচিত, সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন:

"ইস্তেগফারের প্রকৃত এবং সত্যিকার অর্থ হলো- আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই নিবেদন করা যে, মানবীয় কোন দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায় আর সহজাত প্রকৃতিকে আল্লাহ্ স্বীয় শক্তিতে যেন বলীয়ান করেন এবং স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের গন্ডিভুক্ত রাখেন। এই শব্দটি 'গাফার' থেকে উদ্ভূত যা ঢেকে দেয়া বা আবৃত করা-কে বলা হয়। অতএব, এর অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় শক্তিবলে ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে আবৃত করেন।" ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে যেন তিনি ঢেকে দেন আর অবিরত ইস্তেগফারের ফলে আল্লাহ্ তা'লা তা ঢেকেও রাখেন। তিনি (আ.) বলেন, "কিন্তু ইস্তেগফারের আসল এবং প্রকৃত অর্থ হল, খোদা তা'লা স্বীয় শক্তিবলে ইস্তেগফারকারীকে অর্থাৎ যে ইস্তেগফার করে, তাকে প্রকৃতিগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করা এবং স্বীয় শক্তিবলে তাকে শক্তি যোগানো, স্বীয় জ্ঞানবলে তাকে জ্ঞান দান করা এবং স্বীয় আলো থেকে আলো দান করা। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করে তার থেকে পৃথক হয়ে যাননি বরং তিনি যেভাবে মানুষের খালেক বা স্রষ্টা আর তার সকল অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শক্তি-বৃত্তির স্রষ্টা একইভাবে তিনি মানুষের 'কাইয়্যুম'ও অর্থাৎ যা কিছু তিনি বানিয়েছেন, তাকে স্বীয় বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে হিফাযতকারীও বটে।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় বিশেষ সমর্থনের মাধ্যমে তার সুরক্ষাও করেন। কেননা, তিনি কাইয়্যুমও। "অতএব খোদা তা'লার নাম যেহেতু কাইয়্যুম, অর্থাৎ নিজ সাপোর্ট বা সমর্থনের মাধ্যমে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী, তাই মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, যেভাবে সে খোদার খালিকিয়্যাতের কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে একইভাবে সে যেন স্বীয় সৃষ্টির ছাপকে আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়াতের মাধ্যমে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।" (ইসমাতে আম্বিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৮তম খণ্ড, পৃ: ৬৭১)

অতএব, মানুষের জন্য এটি স্বতঃই প্রয়োজনীয়, যার কারণে ইস্তেগফারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়াত থেকে অংশ লাভের জন্য, মানুষের নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য কি করা উচিত? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ইস্তেগফার কর'।

অতএব, রমযানে মাগফিরাতের দিকে আমাদের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে এই প্রেরণার প্রতি মনোযোগ

রাখার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমত থেকে স্থায়ী অংশ পেতে চাইলে ইস্তেগফার কর, আল্লাহ্ তা'লার কাছে মাগফিরাত যাচনা কর। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা, যিনি এ দিনগুলোতে নিজ বান্দাদের প্রতি খুবই সদয় থাকেন, তাঁর করুণার উভয় ধারা প্রবহমান রয়েছে। একটি হলো সাধারণ কল্যাণ ধারা যা থেকে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবাই অংশ পায় আর একটি বিশেষ কল্যাণধারা, যা শুধু সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা থেকেও যেন আমরা অংশ পেতে পারি। আর এক মু'মিন এই কল্যাণধারা থেকে অংশ পেতে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত থেকে যেভাবে পুণ্য করার শক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করে তেমনই ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদা তা'লার আলো থেকে আলো নেয়া এবং খোদার শক্তি থেকে শক্তি অর্জনে প্রচেষ্টারত থাকে, যাতে সে কখনো খোদার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু না খায় বা খোদা তা'লার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে শয়তানের খপ্পরে না পড়ে। কেননা, খোদার শক্তি যদি সাথে না থাকে, তাহলে শয়তানের আক্রমণ বড়ই ভয়াবহ হয়, তাৎক্ষণিকভাবে মানুষকে তা করতলগত করে ফেলে। তাই ইস্তেগফার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেন মানুষ খোদার শক্তি থেকে শক্তি লাভ করে এবং শয়তানের কাছ থেকে সব সময় নিরাপদ থাকে।

অতএব তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃতিগতভাবে মানুষ দুর্বল, আর এই দুর্বলতা এড়িয়ে খোদার শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার জন্য ইস্তেগফার করা জরুরী।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং খোদার কৃপা ও রহমতকে নিজের জীবনে স্থায়ী করার জন্য মানুষের প্রয়োজন ঐশী সমর্থন। এটি ছাড়া আমরা কিছুই করতে সক্ষম নই। আর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নাম 'কাইয়্যুম' রেখে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর বৈশিষ্ট্য হল, এই নেকী অব্যাহত রাখার জন্য এবং খোদা তা'লার করুণা ও ক্ষমা থেকে স্থায়ীভাবে অংশ পাওয়ার জন্য খোদা তা'লার সাহায্য অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'কাইয়্যুম'-ই বলছে, কোন কিছুকে যদি স্থায়ী রূপ দিতে হয়, তাহলে তোমাদের আমার সমর্থনের প্রয়োজন, তোমরা আমার দিকে এসো। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই সাপোর্ট যা চিরস্থায়ী, একে কখনো ছেড়ে দিও না,। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা হচ্ছেন চিরস্থায়ী এবং স্থিতিদাতা আর তাঁর সমর্থন সবচেয়ে দৃঢ়)।

অতএব, আমাদের একথা বুঝতে হবে যে, মধ্যবর্তী দশক মাগফিরাতের হওয়ার অর্থ এটি নয় যে, এই দশ দিনে যত পার ইস্তেগফার আওড়িয়ে নাও আর এভাবে তোমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাবে। বরং, মহানবী (সা.) এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, রমযান এসেছে, খোদা তা'লা নিজ বান্দাদের নিকটবর্তী হয়েছেন। তোমাদের মনোযোগও দোয়া এবং রোযার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। তাই এখন নিজেদের নেকী বা পুণ্যকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার রহমত এবং করুণা সিন্ধু থেকে স্থায়ীভাবে অংশ লাভের জন্য, নিজেদের প্রকৃতিগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য খোদা তা'লার দরবারে ইস্তেগফারের মাধ্যমে তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনিতে আশ্রয় নাও আর চেষ্টা কর যেন এই অবস্থা চিরস্থায়ী হয়। দ্বিতীয় আশারা বা দশক থেকে প্রাপ্ত আলো এবং শক্তি আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টির জান্নাতে নিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

নাজাতের দশক ঃ খোদা-মিলনের শুভ-সংবাদ প্রদান করে

মহানবী (সা.) বলেছেন, শেষ দশ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশারা। মানুষ যখন খোদার রহমতের চাঁদরে আবৃত হয়, তাঁর আলো থেকে অংশ নিয়ে তাঁর শক্তিবলে যখন এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জানা কথা যে, সে খোদার নৈকট্য অর্জনকারীই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে প্রতিদান শূন্য রাখেন না। তিনি বড়ই দয়ালু এবং অনেক বড় দাতা। মানুষ যখন খোদার সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করে বা নেককর্মের চেষ্টা করে, তখন খোদা তা'লা শুধু এতটুকুই বলেন না যে, ঠিক আছে, আমি তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো না, তুমি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়েছ। বরং জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশারা আখ্যা দিয়ে তিনি (সা.) সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে একথাই বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে স্বীয় জান্নাতের শুভ-সংবাদ দিয়েছেন। (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুস সাওম, বাব মা জাআ ফি ফাযলে শাহরে রামাযানা, হাদীস নম্বর: ৬৮২)

রমযান মাসে দোযখের দ্বার বন্ধ করা হয়, স্থায়ীভাবে তাঁর সমীপে যদি ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে থাক, ইস্তেগফারে রত থাক, পুণ্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখ, তাহলে জাহান্নামের দ্বার শুধু রমযানেই নয়, বরং এই ত্রিশ দিনের ইবাদত, অঙ্গীকার আর অধিকার প্রদান আর তওবা ও ইস্তেগফারের স্থায়ী অভ্যাস, জাহান্নামের দ্বারও চিরতরে বন্ধ করে দেবে।

জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রকৃত মর্ম

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে বলেন:

"ধর্মের উদ্দেশ্য কি? ধর্মের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত ঈমান অর্জিত হয়ে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে মানুষের মুক্তি লাভ করা আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক-বন্ধন রচিত হওয়া। কেননা, সত্যিকার অর্থে সেটিই জান্নাত, যা পরলোকে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাবে। আর সত্যিকার খোদা সম্পর্কে অনবহিত থাকা এবং সেই খোদা থেকে দূরে থাকা এবং তাঁর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা না রাখা, এটিই সত্যিকার অর্থে জাহান্নাম, যা পরলোকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাবে।" (চশমায়ে মসীহি, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৩৫২)

অতএব এই গূঢ় তত্ত্ব আমাদের বুঝতে হবে যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ধারাও এই পৃথিবীতেই সূচিত হয় আর জান্নাত লাভও এই পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়ে যায় আর এই উভয়টির যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, বিভিন্ন অবস্থা এবং রূপে মানুষ যা লাভ করবে, তা মূলতঃ পরকালে হয়ে থাকে।

অতএব, খোদা তা'লার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক, তওবা, ইস্তেগফার, মানুষকে এই পৃথিবীতেই জান্নাতসদৃশ তৃপ্তিতে ধন্য করে যার ব্যাপকতর বহির্প্রকাশ ঘটবে পরকালে। তাই আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং ভালবাসা, তাঁর করুণা এবং ক্ষমা প্রতিনিয়ত যাচনা না করা, তাঁর আদেশ-নিষেধকে জেনেশুনে লঙ্ঘন করারই নামান্তর। এটি খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে।

জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রকৃত চিত্র পবিত্র কুরআন শরীফই তুলে ধরেছে

এ প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) খোলাসা করে বলেন, "পবিত্র কুরআন এটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে যে, এ পৃথিবীতেই এই ধারার সূচনা হয়। তাই তো বলা হয়েছে, **ওয়া লিমান খাফা মাক্বামা রাব্বিহী জান্নাতানে** (সূরা আর-রহমান: ৪৭) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা ভেবে ভীত, তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে। অর্থাৎ একটি জান্নাত তো এই পৃথিবীতেই লাভ হয়। কেননা, খোদার ভয় ও ভীতি তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে। আর পাপের দিকে ধাবিত হওয়া হৃদয়ে এক প্রকার ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি সৃষ্টি করে, যা নিজেই একটি ভয়াবহ জাহান্নাম।"(খোদা-ভীতি পাপ থেকে বিরত রাখে আর মানুষ যখন পাপ থেকে বিরত থাকে, তখন সে এই পৃথিবীতেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পায়। অপরদিকে পাপের পানে ধাবিত হয়ে পাপ সংঘটিত করার ফলে কোন পাপী কখনো শান্তি পায় না। কোন না কোন ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি তার লেগেই থাকে। আর পাপ করার পর মানুষের এই যে অবস্থা, এটি স্বয়ং এক জাহান্নাম।) "কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার ভয়ে ভীত থাকে, সে পাপ বর্জন করে এই আযাব এবং বেদনা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষা পায়, যা রিপুর তাড়না এবং কামনা-বাসনার দাসত্বের ফলে সৃষ্টি হয়।" অর্থাৎ রিপু এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার তাড়নায় পড়লেও, খোদা-ভীতি থাকায় তারা এগুলো এড়াতে পারে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, "আর বিশ্বস্ততা এবং খোদার প্রতি ঝুঁকা এবং তাঁর সামনে বিনত হওয়ার ক্ষেত্রে তার উন্নতি হয়।" (আর মানুষ যখন এগুলো এড়িয়ে চলবে, তখন খোদা তা'লার প্রতি বিনত হওয়ার ক্ষেত্রে সে উন্নতি করবে) "যার ফলে এক স্বাদ এবং প্রশান্তি সে লাভ করে আর এভাবে তার জন্য এ পৃথিবীতেই জান্নাতি জীবনের সূচনা হয়।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫-১৫৬)

অতএব, ইহলৌকিক জান্নাতী জীবন বা পরকালে জান্নাত লাভের প্রচেষ্টা এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া কী এবং তা কীভাবে সম্ভব? তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুসারে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করা শুধু পারলৌকিক জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই পৃথিবীর বা ইহলৌকিক জান্নাত এবং জাহান্নামও রয়েছে। আর এই জাহান্নাম থেকে তখনই রক্ষা পাওয়া সম্ভব, যদি মানুষ খোদা তা'লাকে ভয় করে। আর যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে মহানবী (সা.) বলেছেন, সত্যিকার মুহ্সিন বা সৎকর্মশীল হল সে, যার মন-মস্তিষ্কে সব সময় এই ধারণা বিরাজমান থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখছেন। আর যখন এই চেতনা থাকে যে, খোদা তা'লা আমাকে দেখছেন, তখনই খোদা-ভীতি সৃষ্টি হয়। আর কেবল তবেই মানুষ পাপ এড়াতে সক্ষম হয়। আর যে পাপ বর্জনে সক্ষম হয়, সে উৎকণ্ঠা থেকেও রক্ষা পায়। কোন ব্যক্তি যদি চোর হয় বা ভ্রান্ত বা ভুল কোন কাজ সে করে তবে সব সময় কোন না কোনভাবে এই আশংকা তার থাকে যে, কোথাও আমি ধরা না পড়ি বা কোন প্রকার দুর্নাম না হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, এই ভয় তাকে এই পৃথিবীতেই জাহান্নামে বা দোযখে নিপতিত করে।

সুতরাং খোদা-ভীতি যার আছে, সে এই জগতেও এবং পরকালেও জান্নাত লাভ করে। আর রিপুর তাড়নার শিকার এবং কামনা-বাসনার দাসত্বে যে লিপ্ত, সে এই পৃথিবীতেও আর পরকালেও জাহান্নামের ভাগী হয়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনই আসলে জান্নাত। আর আল্লাহ্ থেকে দূরে যাওয়াই হল জাহান্নাম। অতএব, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলা এবং খোদা-ভীতি আর খোদার তাকওয়াকে সবসময় সমুন্নত রাখা।

অতএব এই সংক্ষিপ্ত হাদীসে তিনটি কথা উল্লেখ করে মহানবী (সা.) যেখানে খোদা তা'লার রহমতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেখানে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ইস্তেগফারের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এরপর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, মানুষ যদি এটি অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে তাঁর প্রতিটি কথা এবং কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। রমযানের স্থায়ী কল্যাণধারা তার জীবনে প্রবাহিত হয় এবং তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয় এবং ইহকাল ও পরকালে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে সে তাঁর জান্নাত লাভে ধন্য হয়।

লায়লাতুল ক্বদরের মাহাত্ম্য

অতএব, এ কথা সর্বদা আমাদের সামনে রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ভাবতে হবে। রমযানের শেষ দশকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আর ঈমানকে চিরকাল নিরাপদ রাখার জন্য এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আরও একটি কথা এবং আরও একটি বিষয়ের প্রতিও মহানবী (সা.) দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন বরং সুসংবাদ প্রদান করেছেন আর তাহলো, রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে রমযানের রোযা রাখে তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয় আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে লায়লাতুল কদরের রাতে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয়, তার অতীতের পাপও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহীহ বুখারী, কিতাব ফাযলু লাইলাতুল কাদরে, বাব ফাযলু লাইলাতুল কাদরে, হাদীস নম্বর: ২০১৪)

লায়লাতুল ক্বদরের অসাধারণ গুরুত্ব

রমযানের রোযাও একই গুরুত্ব রাখে। ঠিক আছে, যদিও এক রাতে পাপ ক্ষমা করা হয় কিন্তু অতীতের কর্মও সামনে থাকে আর রমযানের ত্রিশ দিনেও একই কাজ করতে হয় বা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এগুলো হলো সেই শর্ত যা আবশ্যকীয়। ঈমানী চেতনা এবং আত্মজিজ্ঞাসা, এগুলোও আবশ্যক, অর্থাৎ রমযানের রোযা রাখা এবং লায়লাতুল কদর পাওয়া ও পাপের ক্ষমা লাভ করা। যদি রমযানের প্রথম দিনগুলোতে কোন দুর্বলতা থেকে থাকে, তাহলে শেষ দিনগুলোতে তা দূর করার চেষ্টা থাকা উচিত। মহানবী (সা.) শুধু এই কথা বলেন নি যে, লায়লাতুল কদর যে লাভ করবে, শুধু তারই পাপ ক্ষমা করা হবে, বরং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে রোযা এবং লায়লাতুল কদর ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে অতিক্রম করে, তার উচিত, আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখা। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে থাকেন।

মু'মিনের অনেক বিশেষত্ব এবং মু'মিন সংক্রান্ত অনেক শর্তের কথা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। একইভাবে, আল্লাহ্ তা'লা যেখানেই এই শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে অনেক জায়গায় ঈমানকে সৎকর্মের সাথে যুক্ত করেছেন।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার বরাতে সৎকর্ম করার এবং অন্যের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নির্দেশ বিভিন্ন স্থানে যখন দেয়া হয়, তখন এর প্রতি সর্বদাই আমাদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যখন বলা হয় যে, এগুলো পালন কর, আর তাসত্ত্বেও মানুষ যদি সেগুলো পালনের প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহলে প্রশ্ন হলো, এই আয়াতের অধীনে সে কি তখন মু'মিনদের শ্রেণীভুক্ত হয়? বা আমরা যদি মনোযোগ না দেই, তাহলে কি আমরা মু'মিনদের জামাতভুক্ত বলে গণ্য হতে পারি!

তিনি (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে এবং নিজ ঈমানের অবস্থা বিশ্লেষণ করে রোযা রাখে এবং লায়লাতুল কদর অতিক্রম করে, তাহলে তার পাপ ক্ষমা করা হবে।

অতএব, রমযান এবং লায়লাতুল কদরের কল্যাণ শর্ত-সাপেক্ষ। মানুষের ঈমানে যদি দুর্বলতা থাকে আর অন্যের অধিকার যদি সে পদদলিত করে, তারপরও যদি সে লায়লাতুল কদর দেখেছে বলে দাবী করে, তার মাঝে দোয়ার বিশেষ অবস্থা যদি সৃষ্টি হয়, জীবনে পূর্ণ বিপ্লব আসে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ফযল এবং রহমত তাকে ধন্য করেছে। আর এর দাবী হলো, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা। অবস্থা যদি এমন না হয়, তাহলে, যাকে সে লায়লাতুল কদর মনে করেছে সেটি এক আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, ঈমানও পরিপূর্ণ হওয়া চাই এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনাও থাকা চাই। শুধুই বিশেষ সে রাতই লায়লাতুল কদর নয়। এর তিনটি রূপ রয়েছে। একটি হলো সেই রাত, যা রমযান মাসে আসে। আরেকটি হলো সেই যুগ, যা নবীর যুগ হয়ে থাকে। আরো একটি হলো সাধারণভাবে সকল মানুষের জন্য-প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লায়লাতুল কদর হলো সেটি, যখন সে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৬)

জাগতিক সকল নোংরামি এবং কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে, নিজ ঈমানের ওপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে সকল পাপকে যখন সে ঝেড়ে ফেলে, সেটিই হয় সেই লায়লাতুল ক্বদর। যদি এটি লাভ হয়, আর আমরা সম্পূর্ণভাবে যদি খোদার হয়ে যাই এবং তাঁর নির্দেশাবলী মান্যকারী হই, নিজেদের ইবাদতের মানের উন্নয়নকারী হয়ে যাই, তাহলে এটি আমাদের সেই লক্ষ্য, যা অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যদি এই মর্যাদায় উপনীত হই বা এটি যদি আমরা করতে পারি, তাহলে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত আমাদের দোয়া গৃহীত হওয়ার সময় বলে গণ্য হবে।

আমরা, যারা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকের মান্যকারী, আমাদের প্রয়োজন নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থায় বিপ্লব সাধন করে নিজেদের ঈমানকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যেখানে আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হবে। আমরা আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণা নিয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিতকারী হই আর রমযানের কল্যাণ আমাদের মাঝে চিরস্থায়ী হোক। অতীতের সকল পাপের ক্ষমা যেন আমাদের লাভ হয় আর ভবিষ্যৎ পাপ বর্জনের জন্যও আল্লাহ্ তা'লা নিজ বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের মাঝে শক্তি এবং সামর্থ্য সৃষ্টি করুন। (আমীন)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৬৭)

পাপ হতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় পূর্ণ বিশ্বাস (একীন)

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আ.) বলেন:

১) ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে একীন লাভ করেছে

"হে খোদান্বেষী বান্দাগন! কর্ণ উন্মুক্ত করে শ্রবণ কর, একীনের (দৃঢ় বিশ্বাসের) সদৃশ্য কোন বস্তু নেই। একমাত্র 'একীন'ই মানুষকে পাপকার্য হতে বিরত রাখে, 'একীন'ই মানুষকে পুণ্যকর্ম সাধন করার শক্তি প্রদান করে। একমাত্র একীনই মানুষকে খোদা তা'লার 'আশেকে–সাদেক' বা খাঁটি প্রেমিক করে। 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা পাপ বর্জন করতে পার? 'একীনের' জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে কি তোমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন শান্তি লাভ করতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করতে পার? আকাশের নিম্নে কি এমন কোন 'কাফফারা' (Atonement বা প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (বদলা) আছে, যা তোমাদিগকে পাপ বর্জন করাতে পারে? মরিয়মের পুত্র ঈসার কল্পিত রক্ত কি তোমাদিগকে পাপ কর্ম হতে পরিত্রাণ দিবে? হে খ্রিষ্টানগণ! এরূপ মিথ্যা কথা বলো না যাতে পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। স্বয়ং যীশুও তাঁর পরিত্রাণের জন্য 'একীনের' মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি 'একীন' করেছেন, তাই 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করেছেন। পরিতাপ সকল খ্রিষ্টানদের জন্য! যারা এ কথা বলে জগতকে প্রতারিত করে যে, তারা মসীহের রক্তের দ্বারা 'নাজাত' লাভ করেছে। বস্তুতঃ তারা আপাদমস্তক পাপে মগ্ন। তারা জনে না তাদের খোদা কে, বরং তাদের জীবন অবহেলাময়, মদের নেশায় তাদের মস্তিস্ক অভিভূত: কিন্তু সেই পবিত্র নেশা যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়, তদসম্বন্ধে তারা অনভিজ্ঞ। যে জীবন খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যা মানবের পবিত্র জীবনের ফল, তা হতে তারা বঞ্চিত। অতএব স্মরণ রেখো যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হতে নিস্কৃতি লাভ করতে পারবে না এবং 'রূহুল কুদ্দুস' বা পবিত্রাত্মাও তোমরা লাভ করতে পারবে না। 'মুবারক' (ভাগ্যবান) সে ব্যক্তি যে একীন লাভ করেছে, কারণ সে–ই খোদা তা'লার দর্শন লাভ করবে। 'মুবারক' সে ব্যক্তি যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হতে মুক্তি লাভ করেছে, কারণ সে-ই পাপ হতে পরিত্রাণ পাবে। .....

যদি খোদা তা'লা এবং তার 'জাযা' ও 'সাজার' (পুরস্কার ও দণ্ডদানের) প্রতি তোমাদের 'একীন' থাকত, তবে কি কিভাবে তোমাদের হস্ত, পদ, কর্ণ ও চক্ষু পাপকর্ম করতে সাহস করতো? পাপ 'একীনের' উপর জয়ী হতে পারে না। যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখতে পাও, তখন তোমরা কি প্রকারে সে অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করতে পার? 'একীনের' প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান এর উপর আরোহণ করতে পারে না। যিনি পবিত্র হয়েছেন, তিনি 'একীনের' সাহায্যেই পবিত্র হয়েছেন। 'একীন' দুঃখ বরণ করার ক্ষমতা দান করে। এমন কি এটা এক বাদশাহকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। 'একীন' সর্বপ্রকার দুঃখ সহজ করে দেয়। 'একীন' খোদা তা'লার দর্শন লাভ করিয়ে দেয়। প্রত্যেক 'কাফফারা' (প্রায়শ্চিত্ত) মিথ্যা, এবং প্রত্যেক 'ফিদিয়া' (বদলা) নিস্ফল। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা 'একীন' দ্বারাই লাভ হয়। একমাত্র 'একীন'ই পাপ হতে অব্যাহতি দিয়ে খোদা তা'লার নিকট পৌছায় এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তায় ফিরিশতা অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর করে দেয়। যে ধর্মে 'একীন' লাভের উপায় নেই, তা মিথ্যা। যে ধর্ম 'একীনের' সাহায্যে খোদা তা'লার দর্শন লাভ করিয়ে দিতে পারে না, সে ধর্ম মিথ্যা। যে ধর্মে পৌরাণিক কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু নেই, তা মিথ্যা।"

('কিশতিয়ে নূহ'–পুস্তক, আরো দেখুন: কীভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়–নামক পুস্তক)।

২) ইস্তেগফারের গুরুত্ব:

হযরত আহমদ (আ.) বলেনঃ "শ্রোতামণ্ডলী নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই ইস্তেগফারের আকাঙ্খাই মানুষের গৌরব। যে ব্যক্তি নারীর গর্ভে জন্ম

লইয়াছে, অথচ সদা–সর্বদার জন্য ইস্তেগফারকে নিজ অভ্যাসে পরিণত করে নাই, সে কীট, মানুষ নহে। সে অন্ধ, চক্ষুস্মান নহে। সে অপবিত্র, পবিত্র নহে।" (ইসলামী নীতি–দর্শন, আরো দেখুন কিশতিয়ে নূহ– পুস্তক)।

৩) পরিপূর্ণ ধর্মীয় বিধি–নিষেধ বা কামেল শরীয়তের নির্দেশ–অনুযায়ী 'আল্লাহর হক' ও 'বান্দার হক' পূর্ণ মাত্রায় আদায় করা আবশ্যক

হযরত আহমদ (আ.) বলেন : "খোদার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ শরীয়তের যে ক্রিয়া ইহলোকে মানুষের হৃদয়ের উপর হয়, তাহা এই যে, উহা তাহাকে বন্য, বর্বর অবস্থা হইতে মানুষ করে। তারপর মানুষ হইতে তাহাকে চরিত্রবান-মানুষে উন্নীত করে। তারপর চরিত্রবান-মানুষ হইতে তাহাকে খোদাপ্রাপ্ত মানুষে পরিণত করে। তদুপরি, এই জীবনে সঠিক শরীয়তের বিধান ব্যবহারিক-জীবনে পালনের একটি ফল এই হয় যে, প্রকৃত শাস্ত্রীয়-ব্যবস্থার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষের প্রভাবে মানব জাতি ক্রমে ক্রমে তাহাদের অধিকারসমূহ বুঝিতে পারে এবং ন্যায়পরায়নতা, দয়া এবং সহানুভূতির বৃত্তিগুলিকে স্ব স্ব স্থানে সঠিকভাবে ব্যবহারে তৎপর হয়। খোদা তাহাকে জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাহা কিছু দিয়াছেন, তিনি সব মানুষকে তাহাদের অবস্থা অনুযায়ী ঐ সকল নেয়ামত বিতরণ করেন। এহেন মানুষ সমগ্র মানব জাতির উপর সূর্যের ন্যায় স্বীয় আলোক বিস্তার করেন এবং চাঁদের ন্যায় পরমাত্মা হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া সেই আলো অন্যদের নিকট পৌছান।

সুতরাং ইহাই পরিপূর্ণ-শরীয়তের প্রভাব। পরিপূর্ণ-শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষ আল্লাহ্‌র হক্ এবং বান্দার হক্ পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে, খোদার মধ্যে বিলীন হয় এবং সৃষ্টির সত্যিকার সেবক হইয়া যায়। ইহজীবনের উপর ইহাই শরীয়তের বিধি–বিধান প্রতিপালনের ক্রিয়া।" ('ইসলামী নীতি-দর্শন' পুস্তক)।

৪) দৃঢ় বিশ্বাস লাভের জন্য ওহী-ইলহাম প্রাপ্তি আবশ্যক:

হযরত আহমদ (আ.) বলেনঃ "হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! যে নিজেই অন্ধ সে তোমাদিগকে কেমন করে পথ প্রদর্শন করবে? প্রকৃত জ্ঞান 'রূহুল কুদুসের' সাহায্যে লাভ হয় যার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এ রূহের সাহায্যে তোমরা সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করবে যা অন্যেরা লাভ করতে পারে না। যদি নিষ্ঠার সাথে যাচাই কর তবে তোমরা একদিন এ জ্ঞান লাভ করবে। তখন তোমরা উপলব্ধি করবে যে, এ জ্ঞানই হৃদয়কে সজীবতা দেয় ও জীবন দান করে এবং 'একীনের মিনারায়' (দৃঢ়বিশ্বাসের চূড়ায়) পৌছিয়ে দেয়। কখনো এটা মনে করো না যে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে খোদার 'ওহী' (ঐশীবাণী) আর অবতীর্ণ হবে না, যা অবতীর্ণ হবার তা অতীতেই হয়ে গিয়েছে এবং 'রূহুল কুদ্দুস' পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে, বর্তমানে আর অবতীর্ণ হবে না। কুরআন শরীফে 'শরীয়াত' (ধর্ম–বিধান) শেষ হয়েছে, কিন্তু এরূপ বিধান ব্যতীত সাধারণ 'ওহী'(ঐশীবাণী) শেষ হয় নাই। কারণ 'ওহী' সত্য-ধর্মের জীবন। যে ধর্মে 'ওহী' জারী (প্রচলিত) নেই, সে ধর্ম মৃত এবং খোদার সাহায্য হতে বঞ্চিত।

আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলছি যে, প্রত্যেক দ্বারই বন্ধ হতে পারে কিন্তু 'রূহুল কুদুস'–এর অবতীর্ণ হবার দ্বার কখনো বন্ধ হতে পারে না। তোমরা তোমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও যেন তিনি তথায় প্রবেশ করতে পারেন। জ্যোতিঃ প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তোমরা নিজেরাই নিজ নিজ আত্মাকে এ সূর্য হতে দূরে ঠেলে দিচ্ছ। হে অজ্ঞ! উঠ এবং হৃদয়ের জানালা খুলে দাও। তাহলে জ্যোতিঃ নিজেই তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে।" (আমাদের শিক্ষা–পুস্তক, আরো দেখুন: হাকীকাতুল ওহী)।

৫) মানুষের ইসলাহের (সংশোধনের) তিনটি পদ্ধতি:

আলোচ্য বিষয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা রচিত সংশ্লিষ্ট পুস্তকাবলী বিশেষত 'ইসলামী নীতি-দর্শন' নামক পুস্তক থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি এবং সারাংশের প্রতি সত্যান্বেষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

"আমি বলিয়াছি যে, মানুষের অবস্থাসমূহের মূল উৎস তিনটি। অর্থাৎ, 'নাফসে আম্মারাহ' (অবাধ্য আত্মা), নাফসে লউওয়ামাহ (তিরস্কারকারী আত্মা) এবং নাফসে মুৎমাইন্নাহ (শান্তি–প্রাপ্ত আত্মা) এবং ইসলাহ বা শুদ্ধির পথও তিনটিঃ

'ইসলাহ' বা সংশোধনের প্রথম পন্থা এই যে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অসভ্য মানুষকে নিম্ন স্তরের নীতির উপর কায়েম করিতে হইবে, যেন সে পানাহার এবং বিবাহাদি ও সামাজিক ব্যাপারে মানবোচিত নিয়মে চলে। সে উলঙ্গ বিচরণ করিবে না; কুকুরের মত মৃত খাইবে না এবং অন্য কোন প্রকার অনাচার করিবে না। প্রবৃত্তির সংস্কার কার্যে ইহা সর্ব নিম্ন স্তরের ইসলাহ্। ইহা এই প্রকারের ইসলাহ যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পোর্ট ব্ল্যায়ারের জংলী মানুষের মধ্যে কাহাকেও মানবতার প্রয়োজনীয় উপাদান শিক্ষা দিতে হইলে, প্রথমে ছোটখাট মানবোচিত নীতি এবং শিষ্টাচারের পন্থা শিক্ষা দিতে হইবে।

ইসলাহের দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মানবতার সাধারণ বাহ্যিক-শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পর তাহাকে মানবতার উন্নতমানের নীতিসমূহ শিক্ষা দিতে হইবে এবং মানুষের বৃত্তিসমূহে নিহিত শক্তিসমূহকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও সময়ে ব্যবহার করিবার শিক্ষা দিতে হইবে।

তৃতীয় পর্যায়ে ইসলাহ বা সংস্কার সাধনের পন্থা এই যে, যাহারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হইয়া সাধু সাধকের মত হইয়াছে, তাহাদিগকে ঐশী প্রেম সুধা এবং ঐশী-মিলনের স্বাদ গ্রহণ করাইতে হইবে। ইসলাহের এই তিন পন্থাই কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।"

[চলবে]

রমযানের মাসলা-মাসায়েল

মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ, বাংলাদেশ

(শেষ কিস্তি)

(১১) সেহেরী খাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন করা যায় কি?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "রোযার রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য এক প্রকার পোষাক আর তোমরাও তাদের জন্য এক প্রকার পোষাক" (সুরা বাকারা ঃ ১৮৮)। রাত বলতে ইফতারের সময় হতে সেহেরী খাওয়ার সাদা-কালো রেখার পার্থক্য নির্ণয়ের সময় পর্যন্ত বুঝানো হয়ে থাকে। তবে সেহেরী খাবার পরে স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক কায়েম না হওয়াটাই উত্তম। কেননা মেডিকেল সাইন্সের মতে ভরা পেটে দৈহিক মিলন স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকারক।

(১২) স্বামী-স্ত্রীর মিলনান্তে গোসল ছাড়া সেহেরী খাওয়া যাবে কি?

আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত, সেহেরী খাওয়ার পূর্বেই ফরয গোসলের কাজ সেরে ফেলা। যদি কোন কারণে তা সম্ভব না হয় তবে সমাধান নিম্নরূপ:- উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়শা (রা.) বলেন: এ বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা.) এর নিকট এল। আমি দরজার পেছন হতে লোকটিকে বলতে শুনলাম– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! জানাবাতের অবস্থায় আমার ফযরের নামাযের সময় হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমি রোযা রাখতে পারি কি? উত্তরে হুযূর পাক (সা.) বললেন। 'আমিও কোন কোন সময় জানাবাতের গোসল না করেই সেহেরী খাই এবং রোযা রাখি, আর পরে গোসল করি' (মুসলিম)।

(১৩) রমযানের রোযা রাখা অবস্থায় স্বামী- স্ত্রীর দৈহিক মিলন করার পরিণতি কি?

রোযা রাখা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক-মিলন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেউ যদি এহেন অপকর্ম করে, তবে তার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিধান প্রযোজ্য। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করে রোযা ভাঙ্গার কারণে নবী করিম (সা.) তাকে নির্দেশ দিলেন: 'তুমি একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা দুই মাস রোযা রাখবে অথবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে' (মুসলিম)।

(১৪) রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করা যায় কি না?

এ বিষয়টি অত্যন্ত আপেক্ষিক। কেননা সব মানুষের ধৈর্য্য-শক্তি এক রকম নয়; যে কারণে ব্যক্তির অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা প্রযোজ্য। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা ছিদ্দীকা (রা.) বলেন। রসুলে করীম (সা.) রোযা থাকা অবস্থায় আমাকে চুমু দিতেন'। তোমাদের মাঝে কে এমন আছে, যে নিজের কামোদ্দীপনাকে সংযত রাখতে সক্ষম, যেমন সংযত রাখতেন রসুলে করীম (সা.)। (মুসলিম)

(১৫) মহিলাদের মাসিক বা ঋতুস্রাব অবস্থায় পরিত্যক্ত-রোযা পরে আদায় করতে হবে কি?

হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) গণ কর্তৃক একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেন, হুযূর (সা.) বলতেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের হায়েয (ঋতুস্রাব) কালীন পরিত্যক্ত নামাযের কাযা আদায় হতে অব্যহতি দিয়েছেন, কিন্তু রোযা হতে অব্যাহতি দেননি। হায়েয কালীন পরিত্যক্ত রোযা অবশ্যই কাযা আদায় করতে হবে। আমরা তাঁর নসিহতের আলোকে ঋতুস্রাব জনিত কারণে পরিত্যক্ত রোযাগুলো সুবিধা মত সময়ে আদায় করতাম' (সিয়াসাত্তাহ্)।

(১৬) ভুল-ক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে রোযা হবে কি?

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলে করীম (সা.) বলেছেন: 'রোযা পালনকারী যদি ভুল ক্রমে পানাহার করে, তবে সে তার রোযা পূর্ণ করবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'লাই তাকে পানাহার করিয়েছেন' (মুসলিম)।

অপর এক হাদিস হতে জানা যায় যে, কেউ যদি ভুলক্রমে স্ত্রী-সহবাস করে বা কারো যদি স্বপ্ন-দোষ হয়, তবুও সে তার রোযা পূর্ণ করবে'।

(১৭) ইফতারের সঠিক সময় সমন্ধে আলোচনা করুন।

ইফতারের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বা রেডিও-টেলিভিশনে যে সময়-সূচীর উল্লেখ করা হয়, উহার সাথে সূর্যাস্তের কোন মিল নেই। তারা সূর্যাস্তের তিন-চার মিনিট পরে ইফতারের সময় নির্ধারন করে থাকেন। গ্রাম-গঞ্জে আবার দেখা যায়, রোযাদারগণ ইফতার সামনে নিয়ে মাগরীবের নামাযের আযানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অথচ ইফতারের সাথে আযানের কোন সম্পর্ক নেই। ইফতার করতে হবে সূর্যাস্তের সাথে সাথে। রসুলে করীম (সা.) বলেছেন। 'লোকেরা যতদিন দ্রুত ইফতার করবে, ততদিন কল্যাণের মাঝে অবস্থান করবে' (বুখারী)। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলে করীম (সা.) বলেছেন, যখন সূর্য ঐ (পূর্ব) দিক হতে আসে এবং ঐ (পশ্চিম) দিকে চলে গিয়ে সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় তখন যেন রোযাদার ইফতার করে নেয়' (বুখারী)।

(১৮) ইফতারের সময় কোন দোয়া পাঠ করতে হয়?

'আল্লাহুম্মা লাকা সূমতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া লাকা রিযক্বিকা আফতারতু বিরাহমাতিকা'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমি তোমার জন্য রোযা রেখেছি, আর তোমারই উপর ঈমান এনেছি এবং তোমারই রহমতের রিযিক দ্বারা ইফতার করছি, (মুসলিম)।

(১৯) ইফতারের সময় কি ধরণের খাদ্য বা পানীয় ব্যবহার করা উচিত?

এ বিষয়টি নির্ভর করে রোযাদার ব্যক্তির সামর্থের উপর। তবে ইফতারীর নামে ভুরী-ভোজের আয়োজন করে নিজকে অপব্যয়কারীতে পরিনত করা হতে দুরে থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে যে, জগতের সর্বশ্রেষ্ট মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) সূর্যাস্তের সাথে সাথে সামান্য কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না পেতেন, তবে শুকনা খেজুর, আর যদি তাও না পেতেন, তবে কয়েক ঢোক পানি পান করে ইফতার করতেন, (সূত্র বুখারী-মুসলিম)।

(২০) জামা'তীয় ব্যবস্থাপনায় মসজিদে ইফতারের আয়োজন করা সমন্ধে আলোকপাত করুন।

পবিত্র রমযান মাসে হযরত রসুলে করীম (সা.) কুরআনুল করীম খতম করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামদিগকেও তা করতে বলতেন। ইবাদত-বন্দীগিতে তিনি নিজে রত থাকতেন আর সাহাবাদিগকেও ব্যস্ত রাখতেন। এ সুন্নতের আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিটি মসজিদ বা সুবিধা-জনক কোন স্থানে সাধারণত আছরের নামাযের পর হতে পবিত্র কুরআনের দরসের ব্যবস্থা করে থাকে। এর ফলে রোযাদার ব্যক্তি কিছুটা সময় হলেও জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে নিজকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে করণীয়-কর্ম সমন্ধে চিন্তা ভাবনার সুযোগ লাভ করে থাকেন। এতে সমাজের দরিদ্র রোযাদার ব্যক্তিও তার জন্য বরাদ্ধকৃত দুইটি আনন্দের প্রথমটি সবার সাথে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের অহমিকা কিছুটা হলেও লাঘব হয়। সমাজের প্রত্যেক সদস্য- সদস্যা বায়তুল মালের ফান্ডে ইফতারের চাঁদা প্রদানের ফলে হযরত নবী করীম (সা.) এর বাণী 'যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, সে তার রোযার) সমান প্রতিদান লাভ করে, কিন্তু এর ফলে রোযাদারের প্রতিদানের কোন কম্‌তি হবে না' (বুখারী), এতে নিজেকে শামেল করতে পারে।

(২১) বাংলাদেশে আজ-কাল কোন কোন মুসলিম ফেরকা সৌদি আরবের সাথে তাল মিলিয়ে রোযা রাখছেন ও ঈদের নামায আদায় করছেন। এ বিষয়ে সঠিক ফয়সালা কী?

এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা ফেরকার সিদ্ধান্তের কোনরূপ গ্রহণ-যোগ্যতা নেই। সিদ্ধান্ত যা দেওয়ার তা হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজে প্রদান করেছেন। আর ঐ সিদ্ধান্তের উপর খুলাফায়ে রাশেদ্বীনগণ ও সাহাবায়ে আজমাইন (রা.) আমল করে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.) প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ওপর আমল করার মাঝেই প্রকৃত মঙ্গল নিহিত। আশা করি নিম্নের হাদিসটি উল্লেখিত প্রশ্নের সমাধান কল্পে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। উম্মুল ফযল বিনতে হারিস হযরত কুরায়ব (রা.)-কে কোন কাজে সিরিয়াতে পাঠালেন। কুরায়ব (রা.) বলেন, 'জুমআর দিন সন্ধ্যায় আমি সিরিয়ার আকাশে চাঁদ দেখলাম। পরের দিন মদিনাতে ফিরে এলাম। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) কে বললাম, আমি জুমআর দিন সিরিয়ার আকাশে চাঁদ দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি নিজে চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, হ্যা আমি দেখেছি এবং অন্যেরাও দেখেছে। এবং তারা মুয়াবিয়া রোযা আদায় করেছে। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আর রোযা রাখতে থাকব। শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি বললাম, সিরিয়াবাসীর চাঁদ দেখা অথবা মুয়াবীয়ার চাঁদ দেখা আপনার জন্য যতেষ্ট নয় কি? তিনি বললেন না, যতেষ্ট নয়। কেননা আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) আমাদেরকে বলেছেন: 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে আর চাঁদ দেখে রোযা ছাড়বে। চাঁদ না দেখা গেলে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে"(মুসলিম)। উল্লেখিত হাদিস হতে প্রতীয়মান হয় যে, সৌদি আরবে চাঁদ দেখা গেলে সৌদি আরব বাসী রোযা রাখবে। বাংলাদেশের ভৌগলিক-সীমান্তে চাঁদ দেখা গেলে বাংলাদেশের মানুষ ঈদ করবে।

(২২) ইতেকাফ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ইতেকাফ অর্থ কোন স্থানে অবস্থান করা। ইসলামি পরিভাষায় রোযা রেখে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতেকাফ বলা হয়। পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারার ১৮৮ আয়াতে মসজিদে ইতেকাফ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। যুবক-যুবতী বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কারো জন্যই রোযা ছাড়া ইতেকাফ নেই।

কেননা, হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'লা- ইতেকাফা ইল্লা বি সাওমে'– অর্থাৎ রোযা ব্যতীত ইতেকাফ নেই। (আবু দাউদ) ইসলাম ধর্মের পূর্বেও কোন কোন ধর্মের অনুসারীগণ মসজিদে ইতেকাফ করতেন। যেমন সুরা বাকারা ১২৬ ও সুরা মরিয়ম ১৭-১৮ আয়াত দ্রষ্টব্য।

ইতেকাফে এমন মসজিদে বসতে হবে, যে মসজিদে বাজামাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় হয়ে থাকে। কোথাও যদি মসজিদ না থাকে তবে ঘরের ভিতরে নিদিষ্ট জায়গায় হুজরা বানিয়ে ইতেকাফ করা যেতে পারে। মসজিদ এরিয়াতে প্রাকৃতিক কাজ সমাধানের ব্যবস্থা না থাকলে উহা সমাধানের জন্য মসজিদ এরিয়ার বাইরে যাওয়া যেতে পারে। ইতেকাফ অবস্থায় জামাতী কাজে অংশ নিতে মসজিদের বাইরে যাওয়া যাবে না। তবে ইতেকাফ অবস্থাতেও মসজিদে অন্য লোক না থাকলে স্ত্রীর খেদমত গ্রহন করা যেতে পারে। কেননা, হযরত আয়শা (রা.) বলেছেন। ইতেকাফ রত অবস্থায় আল্লাহর রসূল (সা.) হুজরা থেকে তাঁর মাথা মোবারক বের করে দিতেন আর আমি তাঁর মাথায় চিরণী করে দিতাম (বুখারী)। "ইতেকাফ রত অবস্থায় স্বামী- স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮)। ইতেকাফের হুজরা বা তাঁবু বানানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মুসল্লিদের নামায আদয় করতে জায়গার সমস্যা না হয়। মসজিদে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা থাকে, তবে প্রয়োজনে পর্দার ভিতরে চকি বা খাটিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। হুযূর (সা.) নিজে চারপায়ী ব্যবহার করতেন। (ইবনে মাজা) মহিলাদের মাসিক শুরু হলে ইতেকাফ ত্যাগ করে মসজিদ হতে বের হয়ে যেতে হবে। কোন মহিলা ইতেকাফ করতে চাইলে স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। কেননা, হযরত উম্মুল মু'মিনীগণ (রা.) ইতেকাফ করতে চাইলে হুযূর (সা.) এর নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করতেন।

হযরত আয়শা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র নবী (সা.) ওফাত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছর রমযানের শেষ দশ দিন নিয়মিত মসজিদে ইতেকাফ করতেন। এর পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণও মসজিদে ইতেকাফ করতেন'। (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলে করীম (সা.) প্রতি বছর রমযানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন। অত"পর যখন সেই বছরটি এলো, (তিনি ইন্তেকাল করলেন), সে বছর তিনি বিশ দিন ইতেকাফ করেন'। (বুখারী)

হযরত রসুলে করীম (সা.) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ইতেকাফে বসে, আল্লাহ্ তা'লা তার এবং জাহান্নামের মাঝে তিনটি এমন খাল খনন করেন, যার মধ্যবর্তী-দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব অপেক্ষা বেশি' (ফিকাহ আহমদীয়া)

(২৩) এ পর্যায়ে লাইলাতুল কদর বিষয়ে আলোচনা করুন।

লাইলাতুল কদর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "নিশ্চয় আমরা এটি (কুরআনকে) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে যে, কদরের রাত কী? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে ফিরিশতারা এবং পবিত্র আত্মা সব বিষয়ে তাদের প্রভূ- প্রতিপালকের আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে" (সুরা কদর)।

হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলে করীম (সা.) রমযানের শেষ দশকে লইলাতুল কদরের সন্ধান করতে বলেছেন' (বুখারী)।

রসুলে পাক (সা.) বলেছেন যে, 'রমযানে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার রাত হতে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত (বুখারী)।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন। আমি বলছি যে, লাইলাতুল কদরের দুটি ব্যাখ্যাই সঠিক। এটি সাধারণ ভাবে প্রচলিত যে, এটি এমন একটি রাত যা আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া কবুলিয়তের জন্য খুবই উপযোগী। দ্বিতীয়টি এই যে, লাইলাতুল কদর সেই সময়কে বুঝায় যখন জ্ঞানের আলোর অভাবে অন্ধকার জগতে ধর্মের সত্যতার ব্যবস্থা নির্ধারিত থাকে' (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য-সদস্যাগণ লাইলাতুল কদরের প্রভাত লগ্নে অবস্থান করছেন। প্রত্যেক আহমদীর জন্য বর্তমান যামানা দোয়া কবুলীয়তের যামানা হিসাবে চিহ্নিত। সুতরাং আসুন, সবাই মিলে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য সদা-সর্বদা দোয়ায় রত থাকতে সচেষ্ট হই।

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(২য় কিস্তি)

জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় যাওয়া কিভাবে সম্ভব হলো

আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে পড়ে গেলো। আড়ানী শহরের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে পাঁচপাড়া গ্রামে আমি লজিং থাকতাম। পাশের গ্রামে আমার এক সহপাঠী জমিরউদ্দীন বা সংক্ষেপে জমির ভাই লজিং থাকতো। আমরা প্রায়ই স্কুলের পরেও দেখা করতাম। একদিন সে বললো, আগামী কয়েকদিন পরে 'শবে বরাত'এর রাত। আমাদের গ্রামের লোকেরা সারারাত নামায পড়বে। তুমি যাবে কি না? ঐ রাতে ভাগ্য নির্ধারণ হয়। আমি তার সাথে তার গ্রামে গেলাম। প্রায় সারারাত নামায পড়লাম ভাগ্য নির্ধারণের জন্য। কী দোয়া করেছিলাম মনে নেই। তাদের গ্রামে বড় বিল (জলাশয়) ছিলো। সেখানে ফাঁদ পেতে সাদা বক ধরা হতো। আমাকে বকের গোস্ত খাওয়াতে জমির ভাই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সকালে বক জবাই করতে গেলে বকটি ছুটে পালিয়ে যায়। বকের গোস্ত আর কোন দিন খাওয়া হয়নি।

এবার রাবওয়া যাবার চেষ্টার গল্প শুরু করি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর সবাই যেহেতু আমাকে রাবওয়া যেতে বাধা দিচ্ছিলেন, তাই নিয়্যত করলাম, আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা দরকার যে রাবওয়া গেলে সফল হতে পারবো কি-না। ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসতে হবে না-তো! তেবাড়িয়া (নাটোর) জামাতের পাশের গ্রামের এক বুযুর্গ ভাই, বন্ধুও ছিলেন। তিনি বললেন, রাবওয়া না গিয়ে আপনি আমার বড় মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি থাকলে নাটোর কলেজে ভর্তি হয়ে যান। আমরা ভালো বন্ধু ছিলাম। তাঁর বড় মেয়ের তখন দশ-এগারো বছর বয়স হবে হয়তো। আমি বললাম, আমি রাবওয়া থেকে পাশ করে বড় মওলানা হয়ে দেশে এসে আপনার ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো। তিনি বললেন, আপনি ফেরত আসার পূর্বেই আমার ছোট মেয়ে, তৃতীয় মেয়েরও বিয়ে হয়ে যাবে। বাস্তবে তাই হয়েছিলো। তিনি অল্প বয়সেই তার মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাই। কীভাবে কি করবো ভাবছিলাম। কাউকে জানালাম না। আমার মন বললো, রোযা রাখা দরকার। রোযা আরম্ভ করলাম। তখন আমি বাগমারা গ্রামে ওয়াজউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে লজিং থাকতাম। দুই রোযার পর তৃতীয় রোযায় সেহরী খেতে উঠলাম। প্রতিদিন পরিস্কার কাপড় পরে পরিস্কার বিছানায় সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার করে ঘুমাতাম। ঘুম ভাঙ্গার সময় লক্ষ করলাম যে, আমি মুখে কুরআনের একটি আয়াত পড়ছি। সূরা বাকারার শেষ আয়াতের শেষাংশ। 'আনতা মাওলানা, ফানসুরনা আলাল কওমীল কাফিরীন।" অনুবাদঃ (হে আল্লাহ!) তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।"

আয়াতটি মুখস্ত ছিলো না। কিন্তু ঐ সূরার শেষ রুকু মুখস্থ করতে আরম্ভ করেছিলাম। কোনভাবে জেনেছিলাম যে, সূরা বাকারার শেষ রুকু পড়ে রাতে ঘুমাতে হয়। সকালে ঐ আয়াতের শেষাংশের অনুবাদ দেখলাম এবং বুঝলাম যে, এ তো মোবাল্লেগ (প্রচারকের) সাহেবদেরকে আল্লাহ সাহায্য করবেন বলে বলা হয়েছে। মনে হয়, আল্লাহ আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাহলে তো আমি মোবাল্লেগ হতে পারবো। এরপর খুব জোরালোভাবে চেষ্টা ও দোয়া শুরু করলাম, রাবওয়া যেতেই হবে। আমি জামাতের নিয়মাবলী জানতাম না। আহমদীরা বললেন, আমি যেন বারবার মোহতরম আমীর সাহেবকে লিখতে থাকি। অতএব, লিখতে আরম্ভ করলাম যে, দয়া করে আমার রাবওয়া যাওয়ার সুযোগ করে দিবেন। আমীর সাহেবের খুব ভালো গুণ ছিল। তিনি প্রত্যেক চিঠির উত্তর দিতেন। আমি বারবার লিখতাম, তিনি প্রত্যেক বার উত্তর দিতেন। ইতোমধ্যে ম্যাট্রিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে। আমি হায়ার সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছি। আমার সমস্যা ছিল যে, আমাকে রাবওয়া যাবার বিষয়টি গোপন রাখতে হয়েছিলো। আমার আব্বা জেনে গেলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার ভাইয়েরা বার বার চাপ দিচ্ছিলেন শীঘ্রই ভালো কলেজে ভর্তি হয়ে যেতে। আমি বলতে পারছিলাম না যে, আমি তো রাবওয়া যাবার চেষ্টা করছি। বার বার কাফুরিয়া মসজিদে যেতাম। কবে, কোন্ কলেজে ভর্তি

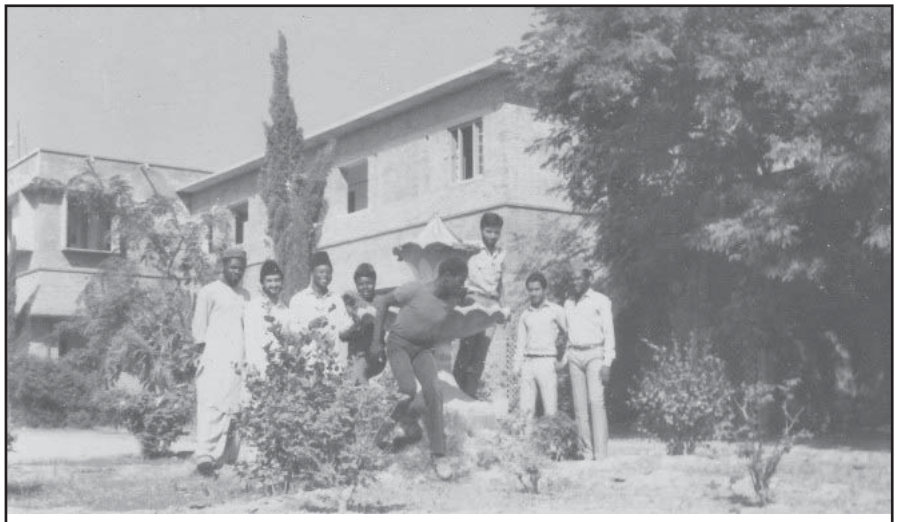

জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়া

হচ্ছি এ প্রশ্ন তখন সবার মুখে। শেষে আড়ানী যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। বাগমারা লজিং বাড়ি থাকছি। সকাল বিকাল ফসলের ক্ষেতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ইতোমধ্যে রাবওয়া থেকে তাহরীকে জাদীদের ওয়াকফে জিন্দেগী ফর্ম আসলো। উর্দূতে ফর্ম ছিলো। ভাগ্য ভালো সে সময় মৌলভী হামজা আমীর আলী মোয়াল্লেম সাহেব কাফুরিয়ায় ছিলেন। তিনি রাবওয়া কয়েকমাস মোয়াল্লেম কোর্সে পড়ে এসেছিলেন। তিনি উর্দুতে ফর্মটি পূরণ করে রাবওয়া পাঠিয়ে দিলেন। আমি অধীর অপেক্ষায় রাত-দিন কাটাতে লাগলাম। রাবওয়া থেকে কী উত্তর আসে। উত্তর তো আর আসে না।

কোন কারণে এক দিন আড়ানী হাটে গেলাম। বাল্যবন্ধু সরেরহাট প্রাইমারী স্কুলের সহপাঠী জিন্নাত আলীর সাথে দেখা। সে বললো, তোমার কী হয়েছে, তুমি নাকি পাগল হয়ে গেছ? আমি পাগল হয়েছি কি না সে উত্তর দিয়ে লাভ নাই। তবে ধরে নাও পাগল হয়ে গেছি। এখন যদি জানতে চাও, কিসে পাগল করেছে, কেন পাগল হয়েছি, তাহলে কবে আবার আড়ানী হাটে আসবে বল। আমি তোমাকে কিছু বই দিবো। সে একদিন আসবে বলে দিল। ঐদিন আমি আমার কাছে আহমদিয়াতের বই যা ছিল সব তাকে দিয়ে দিলাম। বললাম, সাবধান! কাউকে দেখাবে না। বিপদ হতে পারে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমার ঐ বইগুলো পড়ে প্রথমত সাজাদার রহমান ১৯৭৫ সালে আহমদিয়াত গ্রহণ করে। পরে এক এক করে আরো ৫/৭ জন আহমদীয়াত গ্রহণ করে। ১৯৭৬ সালে খায়েরহাটে যে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তার নামকরণ করা হয়েছিলো তাহেরাবাদ। আমার জন্য আনন্দের বিষয় যে, আমরা, যারা প্রাইমারীতে একই ক্লাসে পড়তাম, তাদের আটজন আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। পরে তো আরো মানুষ শামীল হয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, জিন্নাত আলীকে বই দিয়েছিলাম কিন্তু জিন্নাত আলী অনেক পরে ১৯৮৩ সালে বয়াত করেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। জিন্নাত আলীর কাছে জানলাম যে, পাগল হয়েছি। চিন্তা করলাম আমি ছাত্র নেতা ছিলাম। আরো অনেক অনেক পরিচয় ছিল। খুব সুপরিচিত ছিলাম। আমরা সব ভাই আড়ানী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। আমাদের সবারই সুনাম ছিল। এখন আড়ানী শহরে যাই না, আড্ডা দেই না। সবাই ভর্তি হচ্ছে। আর আমাকে কেউ দেখে না। তাই হয়তো বন্ধুরা এমন মনে করেছে।

কয়েকদিন গভীর রাতে মসজিদে গিয়ে নামাযও পড়লাম। একদিন গ্রামের লোকেরা চোর মনে করে মসজিদ ঘেরাও করেছিল। বাতি জ্বালালাম। আমি লজ্জিত হলাম। তারপর আর মসজিদে গেলাম না।

কমপক্ষে তিনদিন বিভিন্ন সময় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাফুরিয়া গিয়েছি। রাবওয়া থেকে কোন উত্তর এসেছে কি-না জানতে। উত্তর আসে না। অগত্যা আড়ানী নতুন কলেজে। ভর্তির শেষ তারিখে ভর্তি হয়ে গেলাম।

একদিন কাফুরিয়া গেলাম। তখন অক্টোবর মাস। মোয়াল্লেম সাহেব বললেন, আজকাল রাবওয়াতে মজলিস আনসারুল্লাহ'র বার্ষিক ইজতেমা হচ্ছে। আমীর সাহেব রাবওয়া গিয়েছেন। আপনি আমীর সাহেবকে পত্র লিখুন। তিনি যেন খোঁজ নেন, আপনার যাওয়ার কী হলো? আমীর সাহেবকে লিখলাম। মায়ের সাথে দেখা করতে গেলাম। বললাম, আপনি গোপন রাখতে পারবেন কি না। যদি গোপন রাখেন, তাহলে বলবো। বললাম, আমি রাবওয়া চলে যাব। মা বললেন, না গেলে কী হবে? আমি বললাম, আপনার ছেলে বড় হতে পারবে না। আমার মা কথা দিলেন, গোপন রাখবেন। আব্বা জানতে পারলে আমাকে দঁড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেন।

তারপর মনে আসলো, তারেক বিন যিয়াদ স্পেনে গিয়েই সমস্ত নৌকা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, যেন ফেরত যাওয়া সম্ভব না হয়। আমি ভাবলাম, আল্লাহকে বিপদে ফেলা দরকার। আমার রাবওয়া যাওয়া কেন হবে না। এক প্যাকেট পোস্ট কার্ড কিনলাম। ২৫টি পোস্ট কার্ডে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে পত্র দিলাম যে, আহমদী হয়েছি, উচ্চ শিক্ষার জন্য আহমদীয়াতের কেন্দ্রে চলে যাচ্ছি। অথচ তখনো রাবওয়া থেকে কোন পত্র পাইনি।

কলেজে ক্লাস শুরু করলাম। পাঁচদিন ক্লাস করেছিলাম। কাফুরিয়া গেলাম অথবা মোয়াল্লেম সাহেব পত্র দিলেন মনে নেই। আমীর সাহেব রাবওয়া থেকে পত্র দিয়েছেন, আমি যেন ১৪ নভেম্বর ঢাকা পৌঁছে যাই। রাবওয়া যেতে হবে। আমি তাড়াতাড়ি আড়ানী ছেড়ে কাফুরিয়া চলে গেলাম যেন কোন ঝামেলা না হয়। এখন সমস্যা দেখা দিল টাকা কে দিবে? আমার এক টাকা কয়েক আনা ছিল। বাগমারা লজিং বাড়ি ছেড়ে কাফুরিয়া যাবার সময় গ্রামের এক রাখাল বালক বললো সে আমার সাথে আমার সুটকেসটি বহন করে কাফুরিয়া পর্যন্ত যাবে। সে যখন আমার থেকে বিদায় নিলো, আমার ঐ টাকা-পয়সাগুলো তাকে

সৈয়দ মীর দাউদ আহমদ

দিয়ে দিলাম। আজকের পাঠকগণ হাসবেন। সে যুগে গ্রামের মানুষের হাতে নগদ টাকা থাকতো না। কিছু কিনতে হলে, কিছু জিনিষ, যেমন- ধান, চাল, সুপারী, বাজারে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে কিছু কিনতে হতো। তখন তো সাধারণ শাক-সবজি মাছ– এগুলো গ্রামে খুব একটা কিনতে হতো না। সব গ্রামের বাড়িতেই পাওয়া যেত। যাহোক, আমার ঢাকা যেতে প্রায় ১৬ টাকা দরকার। কারো কাছে টাকা নেই। ঝরঝর বৃষ্টি হচ্ছে। খুব ভয় পেলাম, যদি সময়মতো ঢাকা পৌঁছাতে না পারি! জীবনের সবচেয়ে বড় ভর্তি-পরীক্ষায় যদি আমি ফেল করি, তো কী হবে?

অবশেষে কাফুরিয়ার প্রেসিডেন্ট আছেরুদ্দীন সাহেবের বাবা, বৃদ্ধ মানুষ, তিনি বললেন, মসজিদে একটি তালা লাগানো কাঠের বাক্স আছে। মসজিদে যারা চাঁদা দেয়, তারা ঐ বাক্সে টাকা পয়সা রাখে। সেটি খুলে যেন আমাকে দেয়া হয়। সবাই একবাক্যে বললেন, ঠিক আছে। তালা খুলে দেখা গেল যতদুর আমার মনে আছে সেখানে সতেরো টাকা পাওয়া গেল। আমি ১৪ই নভেম্বর সকালে যাত্রা করলাম, সন্ধ্যায় আহমদী হেডকোয়ার্টার ৪নং বকশীবাজারে পৌঁছে গেলাম। সম্ভবতঃ এশার নামাযের পরে। কাফুরিয়া থেকে পাকা সড়ক পর্যন্ত হেঁটে। তারপর বাসে বসে সিরাজগঞ্জ ঘাট। তারপর ফেরীতে যমুনা পেরিয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাটে নেমে ট্রেনে করে ঢাকা। মোট ১৪ বা ১৫ টাকা খরচ হয়েছিল। আল্লাহর রহমতে ঢাকা ৪নং বকশীবাজার দারুত তবলীগে পৌঁছে গেলাম।

আমীর সাহেব আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার রাবওয়া যাওয়ার জন্য মোট তিন'শ টাকা অনুমোদন করলেন। ২৫০/- (আড়াই'শ টাকা) ঢাকা-লাহোর পি.আই.এ. এর বিমান ভাড়া। তারপর লাহোর থেকে ট্রেনযোগে রাবওয়া।

আমার আগ্রহ ছিল বৃহস্পতিবার অথবা সোমবার যেন আমার যাত্রা হয়।। দেখে খুব খুশী হলাম যে ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার ছিল। আর লাহোর যাবার জন্য বিমানের টিকেট নেয়া হয়েছে সোমবারের, ১৮ই নভেম্বর।

সোমবার সকাল ১০-১১টায় বিমান যাত্রা করলাম। প্রায় দুপুর ১টায় লাহোর পৌছলাম। আমীর সাহেব কয়েকটি উর্দু বাক্য শিখিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, লাহোর এয়ারপোর্টে নেমে বিমানের বাসে মাল রোডের বিমান-অফিসে। সেখান থেকে টাংগা বা টমটমে অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়িতে রেলস্টেশন। লাহোর স্টেশন থেকে লাহোর-সারগোদার ট্রেনে রাবওয়া স্টেশনের টিকেট নিলাম।

বিকাল ৪টায় যথাসময়ে রাবওয়া যাওয়ার ট্রেনে বসে খুব ভাল লাগল। একা হলেও সফর ভালই কাটছিল। দোয়া ছাড়া কোন কাজ ছিল না। আর চতুর্দিকের দৃশ্য দেখছিলাম। চারপাশে মানুষ কথা বলছে। কারো কথা বুঝি না সেদিকে মনোযোগও ছিল না। হঠাৎ এক বাঙ্গালী সাহেবের সাথে দেখা। তিনি সেনাবাহিনীতে চাকরী করেন। তার গন্তব্য সারগোদা সেনানিবাসে। রাবওয়ার নাম শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন-তুমি কাদিয়ানী! হতভাগা! ইত্যাদি। বাংলায় কথা হচ্ছিল কেউ বুঝলো না। একটু পরে জোরে জোরে শব্দ শুনে লক্ষ্য করলাম লোহার ব্রীজের উপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। এর উপর দিয়ে বাস-ট্রাকের জন্য পাকা সড়ক, নিচ দিয়ে ট্রেন। বুঝতে পারলাম, রাবওয়া এসে গেছে। রাবওয়া রেল স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম। স্টেশন জনশূন্য। একজন বৃদ্ধ মানুষের সাথে দেখা। বললাম, জামেয়া আহমদিয়া যাবো। তিনি আমার থেকে সুটকেসটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করলাম। জামেয়া হোস্টেলের গেটে ঢুকে নিকটে বারান্দায় সুটকেস রাখলাম। কয়েকজন দ্রুত এগিয়ে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম ঢাকা থেকে এসেছি। তাড়াতাড়ি মওলানা আনিসুর রহমান সাহেবকে ডেকে আনলেন, তিনি শেষ বর্ষের ছাত্র। মাগরিবের পর রাতের খাবার শেষ। আমি এসেছি এশার পর। মওলানা হায়দার আলী জাফর বর্তমানে মোবাল্লেগ ইনচার্জ জার্মানী। তিনি আমার জন্য তার নিজের স্টোভে ভাত রান্না করে খাওয়ালেন।

পরের দিন ১৯ নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০:০০টায় প্রিন্সিপাল হযরত সৈয়্যদ মীর দাউদ আহমদ সাহেবের অফিসে গেলাম। তিনি ইন্টারভিউ নিলেন। আমি উর্দু এমন পড়তে পারি যে কেবল অক্ষর চিনি বলা যায়। ভর্তি হয়ে গেলাম। স্পেশাল ক্লাসে সিট পেলাম, যেখানে সবাই আমার মত নবাগত, উর্দু জানেন না। ইংরেজিতে আমাদেরকে উর্দু পড়ানো শুরু হলো আর কুরআন নাযেরা। নতুন জন্ম, নতুন জীবন আরম্ভ হয়ে গেল। আমার আনন্দ হচ্ছিল। আমার সাথে একজন ইন্দোনেশিয়ান মুনিরুল ইসলাম ইউসুফ আর দু'জন ফিজি আইল্যান্ডের ছাত্র ছিলেন।

পাঞ্জাবীরা যখন যে সময় পায় আমার সাথে এসে কথা বলতে শুরু করেন। অর্থাৎ উর্দূতে কথা বলানোর চেষ্টা। কিন্তু কষ্ট এই যে, রুটি খেতে পারি না। গ্রামের ছেলে, কখনো রুটি খাইনি।

মওলানা আনিসুর রহমান বললেন, প্রিন্সিপাল সাহেবকে গিয়ে বল, কয়েকদিন ভাত খাওয়ার অনুমতি চাই। গেলাম মীর সাহেব তথা প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে। তিনি আমার আবদার শুনে সুন্দর করে বললেন, দেখ যদি এদেশে থাকতে চাও, তাহলে রুটি খাওয়া শিখে নাও। আর চাউল খাওয়া ভুলে যাও।

কাহিনী দীর্ঘ করতে চাই না। জামেয়াতে প্রায় আট বছরের বেশী লেগে গেছে। অনেক আনন্দ, অনেক কষ্ট। প্রায় সারাক্ষণই আনন্দ আবার কিছুক্ষণ পরপর কষ্ট। হাতে টাকা থাকে না। তারপর আমি যাওয়ার পরপরই শীত এসে গেল। আমি শীত সহ্য করতে পারতাম না।

(চলবে)

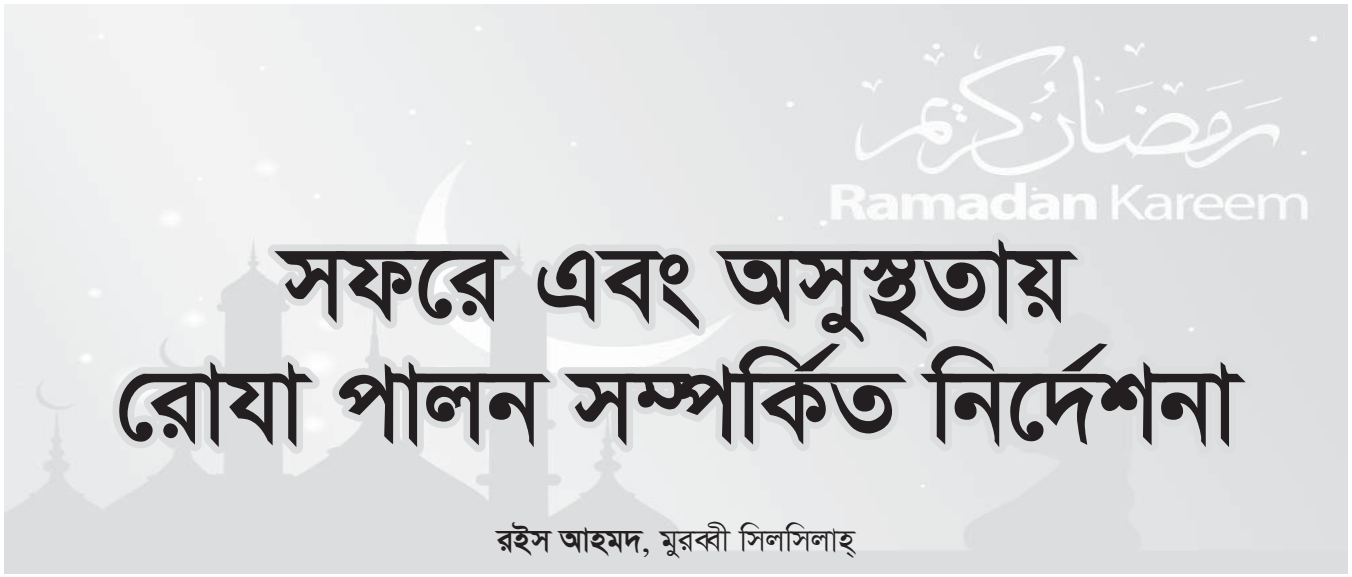

সফরে এবং অসুস্থতায় রোযা পালন সম্পর্কিত নির্দেশনা

রইস আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে প্রাকৃতিক ধর্ম এবং এর সমস্ত বিধি-বিধান পৃথিবীবাসী মানুষের ফিতরত এবং চরিত্রের সাথে সন্নিবেশিত রেখে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন, যার ব্যাখ্যা আঁ হযরত (সা.) এর বর্ণনাতে পাওয়া যায়। আর অপরদিকে তিনি (সা.) নিজে সেই বিধি বিধানের উপর আমল করে দেখিয়েছেন। এরপর আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের জীবনে আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নতের উপর আমল করে আমাদের সামনে তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

রোযা সম্বন্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর সমস্ত নির্দেশ হাদীসে বর্ণিত আছে এবং যার উপর তিনি আমল করেছেন এবং আমল করিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সাধারণ মানুষ এই বিধিবিধান ছেড়ে দিয়ে নিজের উপর এমন বোঝা নিয়েছে, যেটা কুরআন এবং হাদীসের বিরোধী, যার মধ্যে আছে– সফরে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোযা না রাখা, সাবালক হওয়ার আগে শিশুদের রোযা না রাখা, গর্ভবতী এবং স্তনদানকারী মহিলাদের রোযা না রাখাও এর মধ্যে শামিল। আশ্চর্যজনক যে অধিকাংশ আলেমধারী লোক সাধারণ মানুষকে শুধু এই জন্য এই ধারণা থেকে বাধা দেন না যে কোথাও যেন তাদের সম্মান না যায়। বিশেষ করে গয়ের আহমদীদের মধ্যে বংশ পরাম্পরায় ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই শিক্ষা জারী আছে। আল্লাহ্ তা'লার শুকুর যে, হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাহদী মাওউদ (আ.) হাকামান এবং আদালান হয়ে এসেছেন এবং তিনি এই সমস্ত অ-স্বভাবজাত এবং অপ্রয়োজনীয় বোঝা থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। রোযার আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু কুরআন মজিদে বলেছেন, ইয়ুরিদুল্লাহ্ বিকুমুল ইয়ুসরা ওয়ালা ইয়ুরিদু বিকুমুল উসরা"। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য সহজ চান আর তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান না।" কিন্তু আফসোসের কথা হলো, যে রোযা সম্পূর্ণভাবে রহমত, মুসলমানরা অজ্ঞতা এবং মূর্খতার দরুন সেটিকে কষ্টদায়ক বানিয়ে নিয়েছে। কিছু লোক তো এই সম্বন্ধে এত শিথীলতা করেছে যে, তাদের রমযানের কোন পরওয়া নাই। রমযানুল মোবারক মাস আসে আর তার ফজল ও রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে চলে যায়। কিন্তু তাদের খবর পর্যন্তও থাকে না যে, রমযান আসলো এবং চলে গেল। আর কিছু লোক এর মধ্যে কট্টরতা অবলম্বন করে। সমস্ত রোযাকে তারা ইসলাম মনে করে। আর সমস্ত অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ, গর্ভবতী, স্তনদানকারী এবং শিক্ষার্থীর জন্যও তারা বিশ্বাস রাখে যে, তারা যেন অবশ্যই রোযা রাখে। যদিও অসুস্থতা বেড়ে যায় অথবা স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

ইসলাম ফিতরতের ধর্ম। কখনই এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষকে তার সফলতার পথ থেকে সরিয়ে দিবে। এর কারণ এটাই যে, ইসলাম নিজের কিছু বিধি বিধানের এমন কিছু শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, যদি এই শর্ত কারো মধ্যে পাওয়া যায় তবে সে যেন এই হুকুমের উপর আমল করে আর যদি না পাওয়া যায় তবে যেন না করে। যেমন হজ্জ যাকাত ইত্যাদির বিধি বিধান। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"ওয়া মান কানা মিনকুম মারিযান আও আলা সাফারিন ফা ইদ্দাতুম মিন আইয়্যামিন উখার ইয়ুরিদুল্লাহা বিকুমুল ইয়ুসরা ওয়ালা ইয়ুরিদু বিকুমুল উসরা"** (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬) অর্থাৎ, "আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির হয় তা হলে সে যেন অন্য দিন গণনা পূর্ণ করে। আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান কঠিন চান না"।

অসুস্থ এবং মুসাফিরদের রোযা রাখার বিধি বিধান সম্বন্ধে এই যুগের হাকামান আদালান সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখে সে খোদা তা'লার স্পষ্ট হুকুমের অস্বীকার করে। খোদা তা'লা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন অসুস্থ এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। অসুস্থ সুস্থ হলে, মুসাফির সফর শেষ হলে রোযা রাখবে। খোদার এই হুকুমের উপর আমল করা উচিত কেননা নাজাত ফজলের ফলে হয়। নিজের আমলের জোর দেখিয়ে কেউ নাজাত পেতে পারে না। খোদা তা'লা এটা বলেন নি যে, অসুস্থতা ছোট অথবা বড় আর সফর ছোট অথবা বড় বরং হুকুম সাধারণ ভাবে। আর এর উপর আমল করা উচিত। অসুস্থ এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তার উপর আদেশ ভঙ্গের

ফতওয়া অবশ্যই লাগবে। (বদর, ১৭ অক্টোবর ১৯০৭, ফিকাহ্ আহমদীয়া ২৯০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, রমযান মাসে সফর করা অবস্থায় রোযা রাখা প্রকৃত পক্ষে যদি আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে দেখবেন এতে নেকী নাই। কেননা মানুষ রমযান মাসে সহজভাবে রোযা রাখে আর যদি রমযানের পরে রোযা আলাদা ভাবে রাখতে হয় তবে বুঝা যায় যে, কঠিন কাজ ছিল। কিছু লোক নেকীর বাহানায় সহজ চায়। আর বলে যে, রোযাকে টালবাহানা করে যতগুলো চলে যায় যাক তা না হলে পরে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। তো যাই হোক আল্লাহ্ অন্তরকে জানেন এই জন্য আল্লাহকে ধোকা দেওয়া যাবে না"।

হুযূর (রাহে.) আরো বলেন, 'আপনি দ্বিতীয়বার বিশ্লেষণ করে দেখেন আপনি এটা জানতে পারবেন যে অধিকাংশ সফরে রোযারাখাকারী এই জন্য রোযা রাখে যে, এখন রমযান মাস চলছে সবাই রোযা রাখছে আমিও রেখে নেই। পরে কে রাখবে।

কিছু পিতা মাতা তাদের ছোট ছোট শিশুকে রোযা রাখান আর তার পর গর্ববোধ করে বলে যে, আমার বাচ্চা এতগুলো রোযা রেখেছে, তাদের রোযা রাখানোর উদ্দেশ্য এটাই যে, পরে তারা ঘোষণা দিতে পারে। আসলে এটা বাচ্চাদের যুলুমের উপর যুলুম আর রোযা থেকে তাকে ঘৃণা এবং সামনে অস্বীকৃতি করার সমার্থক।

স্তনদানকারী এবং গর্ভবতীর সম্বন্ধে তো আঁ হযরত (সা.)-এর বাণীই আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে রোযা থেকে অবকাশ দিয়েছেন।

হাদীসে এসেছে, আঁ হযরত (সা.) বলছেন, 'আল্লাহ্ তা'লা মুসাফেরের জন্য নামায অর্ধেক এবং স্তনদানকারী ও গর্ভবতীর রোযা অবকাশ দিয়েছেন।

রোযা সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কিছু নির্দেশনা পেশ করা হলো, হুযূর (রা.) বলেন, কেউ কেউ আছেন যারা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে রোযা রাখান অথচ প্রত্যেক ফরয এবং হুকুমের জন্য আলাদা আলাদা সীমা এবং আলাদা আলাদা সময় আছে। আমাদের দৃষ্টিতে কিছু বিধিনিষেধের সময় চার বছর বয়স থেকে শুরু। আর কিছু এমন আছে যার সময় সাত বছর থেকে শুরু। আর কিছু এমন আছে যার সময় সাত বছর থেকে বার বছরের মধ্যে।

আর কিছু এমন আছে যার সময় ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। আমার নিকট রোযার হুকুম ১৫ থেকে ১৮ বছরের বাচ্চার উপর। আর এটাই সাবালক হওয়ার সময় সীমা। ১৫ বছর থেকে রোযা রাখার অভ্যাস করাতে হবে আর ১৮ বছর বয়সে রোযা ফরজ মনে করা উচিত। আমার স্মরণ আছে, যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আমাদেরও রোযা রাখার শখ হতো, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযা রাখতে দিতেন না। সুতরাং বাচ্চাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য রোযা রাখা থেকে তাদের বাধা দেওয়া উচিত। তারপরে যখন তাদের সময় এসে যায়, যখন তারা নিজেদের শক্তিতে পৌঁছে যাবে যা ১৫ বছর বয়সে তখন তাদের রোযা রাখানো হোক। আর সেটাও খুব ধীরের সাথে। প্রথম বছর যতগুলো রাখবে পরের বছর তার থেকে কিছু বেশি আর তৃতীয় বছরে তার থেকে বেশি, এই ভাবে পর্যায়ক্রমে রোযা রাখার অভ্যাস বানানো হোক। (আল ফযল ১১ এপ্রিল ১৯২৫, ফিকাহ্ আহমদীয়া, ২৯১ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেন, বৃদ্ধ যার শক্তি শেষ হয়ে গেছে আর রোযা তাকে জীবনের বাকী কাজ থেকে বঞ্চিত রাখে তার জন্য রোযা রাখা নেকী নয়। তারপর সেই শিশু যার শক্তি অর্জনের অধ্যায় চলছে আর সামনের ৫০/৬০ বছরের জন্য শক্তি জমা করছে তার জন্যও রোযা রাখা নেকী হতে পারে না। কিন্তু যার মধ্যে শক্তি আছে আর সে রমযান পায় সে যদি রোযা না রাখে তবে সে গুনার ভাগীদার হবে। (আল ফযল, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, ফিকাহ্ আহমদীয়া, ২৯১ পৃষ্ঠা)

রমযান মুসলমানদের দিক থেকে নিজের সত্ত্বা এবং বংশধরের কুরবানীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়। রোযা দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করা এবং সত্য স্বপ্নের অভ্যস্ত করা ছাড়াও গরীবদের জীবন সম্বন্ধে অনুভূতি সৃষ্টি করা এবং মু'মিনদের মধ্যে কুরবাণীর রূহকে উন্নতি করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রোযা এক বরকতময় ইবাদত। যাদের রোযা রাখার হুকুম আছে তারা রোযা রাখুন আর যাদের হুকুম নাই যেমন অসুস্থ ও মুসাফির রোযা যেন না রাখে আর গণনা পরে পূর্ণ করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে রোযার হুকুমের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(পুনর্মুদ্রিত)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

ব্যবহারিক জীবনে পালনীয় কতিপয় বিষয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুফতি সাহেবের ফয়সালা

যাকাত

(১) ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে মূলধন অথবা লাভ-আসল অথবা শুধু লাভের উপরেই যাকাত হবে কি না?

উত্তওে জানানো যাচ্ছে, ব্যবসায়িক সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাতের ব্যপারে হযরত সৈয়্যদনা মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন- "এই ট্যাক্স যাকে যাকাত বলা হয় এটা শুধুমাত্র লাভের উপরে নয় বরং মূলধন ও লাভ উভয়ের ক্ষেত্রেই সম্মিলিতভাবে আরোপিত হবে।" (নেযামে নও, আনওয়ারুল উলুম, খন্ড-১৬, পৃ-৫৭)

"স্মরণ রাখতে হবে ট্যাক্স যাকে যাকাত বলা হয় এটা লাভের উপরে নয়, বরং মূলধন ও লাভ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর ফলে শতকরা আড়াই ভাগ, প্রকৃত পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে লাভের পঞ্চাশ ভাগই হয়ে যায়।" (আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম, আনওয়ারুল উলুম, খন্ড-৮, পৃ-৩০৬)

হুযূর (রা.) অন্যত্র বলেন, "যাকাতের এক নির্দেশ রয়েছে যা সব ধনীর উপর আবশ্যিক রূপে বর্তায়। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের কাছে টাকা জমায় অথবা ব্যবসার জন্য পশু পালন করে এর জন্য একটা হার নির্ধারিত রয়েছে। এভাবে ক্ষেতের ফসলের জন্যও একটা হার নির্ধারিত রয়েছে। ক্ষেতের ফসলের বেলায় এক দশমাংশ আর ব্যবসায়িক সম্পদের ক্ষেত্রে প্রায় আড়াই শাতাংশ। ...এই আড়াই শতাংশ শুধু মাত্র লাভের উপরে দেয়া হয় না, বরং মূলধন ও লাভ উভয়ের ক্ষেত্রে দেয়া হয়।" (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, পৃ-২৯৫-২৯৬)

অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ মূল্য যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমান হয় অথবা এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে বছরে এক বার সম্পূর্ণ বিক্রয়লব্ধ মূল্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে।

(২) ব্যবসায়িক সম্পদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ট্যাক্স আদায় করার পর অতিরিক্ত শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করা আবশ্যকীয় হবে কি?

উত্তরে জানানো যাচ্ছে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "এই যুগে যেহেতু ট্যাক্স দ্বিগুন হয়ে গেছে। অর্থাৎ সরকারও ট্যাক্স আদায় করে আর ইসলামও একটা ট্যাক্স নেয়। এজন্য যে জিনিষের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে ট্যাক্স ধার্য করা হয়, এই ট্যাক্সে অর্থের পরিমাণ যদি যাকাতের সমান অথবা যাকাতের চেয়েও বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে যাকাত দেয়া আবশ্যকীয় হবে না। .. ইনকামট্যাক্স যদি কম হয় আর যাকাতের উসর যদি বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা যাকাত হিসেবে আদায় করা আবশ্যকীয় হবে।" (তফসীরে কবীর, তফসীর সূরা নূর, পৃ-৩৪০)

আকিকা

(৩) বাচ্চাদের আকিকা জন্মের সপ্তম দিনে করাই কি আবশ্যক, না পরেও করা যায়?

১) মহানবী (সা.) সন্তান জন্মের সপ্তম দিনেই চুল কাটা, নাম রাখা এবং আকিকা দেয়ার কথা বলেছেন। (তিরমিযি, কিতাবুল আযাহা, বাব-মিনাল আকিকা)

২) অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) সপ্তম, চর্তুদশ অথবা এক-বিংশতম দিনে আকিকা করার কথা বলেছেন। (সুনানে বায়হাকী আল কুবরা, কিতাবুল যাহায়া বাব মাযা আ ফি ওয়াকতিল আকিকাহ)

৩) হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, অর্থাৎ নবী করীম (সা.) নবুওয়ত লাভের পর নিজের আকিকা নিজে করেছেন। (অর্থাৎ চল্লিশ বছর পর)। (সুনানে বায়হাকী আল কুবরা, কিতাবুল যাহায়া বাব মাযা আ ফি ওয়াকতিল আকিকাহ)

মুহাদ্দেসীনগণ উপরোল্লিখিত রেওয়াত নিয়ে মতবিরোধ করেন কিন্তু তাদের বিষয়টি কোন আয়াত বা সহী হাদীসের বিরোধী না হওয়ার কারনে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। অতএব, সৈয়দনা হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)কে আকিকার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, কোন্ দিন আকিকা করা উচিত? তিনি (আ.) বলেন,'সপ্তম দিন আর তা যদি করা না যায়, তাহলে খোদা যখন তৌফিক দিবেন তখন। এক রেওয়াতে উল্লেখ রয়েছে মহানবী (সা.) নিজের আকিকা চল্লিশ বছর বয়সে করেছিলেন এমন বর্ণনাকে সুধারনার সাথে দেখা উচিত যতক্ষণ এটা কুরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসের বিপরীত না হবে।" (বদর পত্রিকা ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০৮, পৃ-১০, মলফুযাত, পঞ্চম খন্ড, পৃ-৪৪২)

আকিকা সর্ম্পকে ফিকাহ আহমদীয়াতে লিখিত রয়েছে: বাচ্চার জন্মের সপ্তম দিনে মাথার চুল ন্যাড়া করে এর সমপরিমান রূপা অথবা সোনা সদকা দেয়া, নাম রাখা এবং আকিকা দেয়া রসূল(সা.)এর সুন্নত। হাদীসে এর ফযিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। আকিকার অর্থ হলো জন্তু জবাই করা। ছেলের জন্য দুটি ছাগল অথবা দুম্বা (ভেড়া) আর মেয়ের জন্য একটি ছাগল অথবা দুম্বা(ভেড়া) ইত্যাদি জবাই করা উচিত। জন্তু উপযুক্ত বয়সের মোটাতাজা যেন হয় যদিও এর জন্য কুরবানীর জন্তুর মত বয়সের কোন শর্ত আবশ্যকীয় নয়।

আকিকার মাংস লোকেরা নিজেরাই খেতে পারে, অথবা অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারে। রান্না করে দাওয়াত খাওয়ানো যেতে পারে। এটা থেকে গরীবদেরকেও অংশ দেয়া উচিত। অপারগতায় দুই জন্তু জবাই করতে না পারলে একটিতেই যথেষ্ট। (ফিকাহ আহমদীয়া, ইবাদত অংশ, পৃ-১৮৩)

স্বাক্ষর / মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন
মুফতি সিলসিলাহ রাবওয়া

আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) ঈদের দিনে তাকবীর পাঠ করতেন, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।'

মহান স্রষ্টাকে লাভ করাই আসল ঈদ

মৌ. এনামুল হক রনি

ঈদ মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বৎসরের পরিক্রমায় দু'টি ঈদ মুসলমানদের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে। একটি আসে একমাস রোযা পালনের মাধ্যমে আর অপরটি (নিজ কু-প্রবৃত্তিরূপ) পশু কুরবানীর মাধ্যমে। তাই ঈদ অর্থ আনন্দ, খুশি আর ঈদ অর্থ এই আনন্দ আর খুশির বন্যা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া।

মনে পড়ে যায় জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ঐ গানটির কথা : 'ও মন রমযানের এই রোযার শেষে এলো খুশির ঈদ, আপনাকে আজ বিলিয়ে দিতে আসমানী তাগীদ।' আসমানের তাগীদ তো তাদের জন্য যারা রোযার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। দীর্ঘ একমাস রোযা সাধন করেছে প্রকৃত আনন্দ আর খুশির জোয়ার আজ তাদের অন্তরে-বাহিরে।

মনে পড়ে ছোটবেলার পাঠের কথা, 'আজ ঈদ মদীনার ঘরে ঘরে আনন্দ পথে পথে ছেলেমেয়েদের কলরব। তাদের গায়ে নানা রঙের পোশাক। বাতাসে আতর-গোলাপের সুবাস.....। আহা' আ'..... সেই যেন ঈদের দিনের একটি পূর্ণ ছবি। ঈদের আনন্দ যেমন একজন রোযাদার মু'মিনের যে কিনা রোযা পালন করে নিষ্পাপ মাসুম শিশুর ন্যায় হয়ে গেছে। আর তাই শিশুদের সাথে মিশে গেছে ঈদের আনন্দ, খুশি হৈ চৈ নিয়ে।

মু'মিনগণ সবসময় সৌভাগ্যবান। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, 'ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান' অর্থঃ যে ব্যক্তি তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হতে ভয় পায় তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে। (সূরা আর রহমান)। এই যে, ভয় বা শ্রদ্ধাবোধ স্রষ্টার নির্দেশ পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মু'মিন স্রষ্টার নির্দেশ পালন করে আর জান্নাতকে নিকটতর করে নেয়। হাদীস শরীফে নবী করীম (সা.) বলেছেন, '....রোযাদারের দু'টি আনন্দ প্রথমত: যখন সে ইফতার করে আর দ্বিতীয়ত: যখন (রোযা রাখার কারণে) সে স্রষ্টার সাথে মিলিত হবে।' (বুখারী শরীফ) যারা রোযা রাখে আর ইফতারের সময় খোদার দেয়া রিযিক সামনে নিয়ে এজন্য বসে থাকে যে, খোদার নির্দেশ পালন করবে অর্থাৎ সময় হলেই ইফতার করবে। একজন মু'মিনের এ অবস্থা যেন স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়া অর্থাৎ জান্নাত লাভ। অপরদিকে রোযা রাখার কারণে স্রষ্টার সাথে পরকালে মিলিত হবে। এ উপলব্ধি কেবল একজন রোযাদারই উপলব্ধি করতে সক্ষম। আর এভাবে এক-একটি করে রোযা শেষ হয়ে আসে সেই চরম পাওয়া-'ঈদ' যার অর্থ খুশি ও আনন্দ। তখন সে স্রষ্টার সাথে মিলিত হয়ে যায় আনন্দের বন্যায়। আর তখনই কৃতজ্ঞতায় শোকরানার দু'রাকাত নামায পড়ে, তাকবীর পড়ে সাজ-গোজ করে ইত্যাদি।

মহানবী (সা.)-এর হাদীস থেকে ঈদের বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তিনি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ আর চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) কর। (বুখারী শরীফ) এসব হাদিসে ইফতার বলতে ঈদ বুঝানো হয়েছে। যা কিনা একমাসের রোযা পালন শেষে আসে। তাই রোযা শেষে ঈদের এক ফালি বাঁকা চাঁদ মেঘের কোলে বা নারিকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখামাত্র ঈদ শুরু হয়ে যায়।

শিশু, কিশোরগণ পাড়া মহল্লায় হৈহৈ কলরবে মাতিয়ে তোলে আর আনন্দ প্রকাশের নানারূপ শোভা-সাজ শুরু হয়ে যায়। আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) আমাদের ঈদের জন্য একটি তাকবীর শিখিয়েছেন আর তা হলো, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু

আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। অর্থঃ আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান তাঁর কোন শরীক নাই। এবং আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ মহান আর সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি (সা.) এ তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহে যেতেন। একপথে যেতেন অন্য পথে ফিরে আসতেন।

ঈদের দিনে রসূলে করীম (সা.) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদের দিন গোসল করা পাক-সাফ হওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বা সাধ্যানুযায়ী নতুন কাপড় পরা, সুগন্ধি লাগানো উচিত। একই ভাবে এসব কাজে অন্যকে সহযোগিতা করা যেন ঈদের খুশী ভাগ করে নেয়া যায়। ঈদের দিন বিশেষ করে ঈদুল ফিতরের দিন রসূল (সা.) মিষ্টি খেয়ে বা খেজুর মুখে দিয়ে ঈদগাহে যেতেন। আমরা 'মিষ্টি, সেমাই, জর্দা, পায়েস বা ফিরনী খেতে পারি। এরপর সাজ-গোজ করে আতর-গোলাপ, সুরমা, মেহেদী-লাগিয়ে স্রষ্টার সমীপে জানিয়ে দেয়া দু'রাকাত নামায এর মাধ্যমে, হে খোদা, তোমার বান্দা তোমার সমীপে হাজির। তোমার হাজার হাজার শোকর যে, পবিত্র রমযান পালন করার তৌফিক আমাদের দিয়েছিলে।

আর ঈদের নামাযে আযান ও একামত দেওয়া হয় না তবে দু'রাকাত নামাযে বাড়তি তাকবীর দেওয়া হয়। প্রথম রাকাতে ৭টি তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' বলবে ইমাম সাহেব, মুসল্লিগণ তার অনুসরণ করবে দ্বিতীয় রাকাতে ৫ টি তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' বলবে ইমাম সাহেব, মুসল্লিগণ তার অনুসরণ করবে। বাকী নামাযের সূরা, কলেমা তাসবীহ অপরিবর্তীত থাকবে। এভাবে দু'রাকাত নামায শেষ হয়ে গেলে খুতবা প্রদান করা হবে। রসূলে করীম (সা.) এভাবে নামায শেষ করে খুতবা প্রদান করতেন এবং তারপর মহিলাদের সামনে গিয়ে নসিহত করতেন। ঈদগাহে শিশু, বৃদ্ধ সকলকে হাজির হতে হয় এমনকি ঋতুবর্তী মহিলাদেরকে ঈদগাহে হাজির থাকার নির্দেশ রয়েছে। অবশ্য তাদের জন্য পৃথক জায়গাতে বসার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

ঈদের দিন মহিলাদের দান গ্রহণ করার জন্য হযরত বেলাল (রা.) দান নিয়ে মহিলাদের কাতারের সামনে গিয়ে চাদর বিছিয়ে ধরেছেন সেখানে সদকা দান করা হয়েছে।

এছাড়া ঈদের নামাযের পূর্বে ফিতরানা প্রদান করা হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে সদ্যজাত শিশু ঈদের নামাযের পূর্বে ভূমিষ্ট হলে তার জন্যেও ফিতরানা দেওয়ার প্রয়োজন হবে। আর ঈদের দিন ইশায়াতে ইসলাম বা ইসলাম প্রচারের জন্য ঈদ ফান্ডে চাঁদা দান করা হয়। প্রত্যেককে ঈদ ফান্ডে চাঁদা দেওয়ার জন্য শরীক হওয়া উচিত। রসূলে করীম (সা.) এর যুগেও এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগেও ঈদ ফান্ড আদায় করা হয়েছে। ঈদের আনন্দ করতে গিয়ে আমরা যেন ইসলাম প্রচার কাজকে ভুলে না যাই। তাই সাধ্যানুযায়ী ঈদ ফান্ডে শামিল হতে হয়। স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য ভালবাসার বহি:প্রকাশ হিসাবে ঈদের আনন্দ গরীবদের তোহ্ফা, সদকা, দানকরা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঈদশেষে কোলাকুলি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক মহাসেতু বন্ধন রচনা করে। আত্মীয়-স্বজন নিজ পরিবার পরিজনের কবর যিয়ারত করে থাকে।

ঈদের খুশিতে স্থানীয়ভাবে নানা রকম খেলাধূলার আয়োজন করা যেতে পারে। আনন্দ দানের জন্য শারিরীক কসরত জাতীয় (সার্কাস) খেলা শিশুদের আনন্দ প্রদানে করা যেতে পারে। তবে কোন ক্রমেই অশ্লীলতা প্রকাশ পায় এমন কিছু যেন করা না হয়।

আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) ঈদ উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন, তিনি বলেন, 'আমরা রমযানের রোযা এজন্য রেখেছি যেন তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি। তাক্ওয়া বর্ধিতকারী হতে পারি। এ মাস পূর্ণ হওয়ার পর এ কুরবানী ও রোযা পূর্ণ করার পর আল্লাহ্ তা'লা আজ আমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছেন আনন্দ উৎসব করো। প্রত্যেক বৈধ কাজ যা থেকে তোমাদেরকে নির্ধারিত একমাস সময় বিরত রাখা হয়েছিল তা এখন করো। খাও, আনন্দ কর, নতুন কাপড় পর, সুগন্ধি লাগাও। কিন্তু আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার অবকাশ নাই। কৃতজ্ঞতার সর্বোত্তম পন্থা হলো মসজিদে একত্রিত হয়ে ঈদের নামায পড়। এতে রমযানের রোযার ও কুরবানীর (ত্যাগের) আকারে যে নেকী করেছ বা করার তৌফিক পেয়েছ এর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। সুতরাং এ ঈদ ভাল খাওয়ার ও পরার এবং বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করার নাম নয়। বরং কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ প্রদান করেছেন। তাই এতে শুকরিয়া আদায় কর।' (ঈদের খুতবা, ১৩ অক্টোবর ২০০৭ইং)।

তিনি (আই.) অন্যত্র বলেছেন, 'নিশ্চয় এই খুশি বা আনন্দ আল্লাহ্ এবং রসূলের আদেশ অনুযায়ী আমরা করে থাকি। আর ঈদের আনন্দ উদযাপনের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য বিদ্যমান।.... অতএব আজকে আমাদেরকে এই ঈদ উপলক্ষে একত্রিত হয়ে এই চেষ্টা এবং দোয়া করা উচিত। আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও সেই মানদণ্ড অর্জনকারী হয়ে যাব যার লক্ষস্থল হবে কেবল খোদা তা'লার সত্তা। (ঈদের খুতবা, ৭ নভেম্বর-২০১১)।

অনত্র বলেছেন,...'সুতরাং জামাতের সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা নিজেদের মাঝে দুর্বলদের প্রতি দৃষ্টি রাখি। আর দৃষ্টি তখন রাখা সম্ভব যখন জামাতের সদস্যরা এর গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হবে। এ অনুভূতি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করুন। আমাদের ঈদ তখন প্রকৃত ঈদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে যখন আমরা একে অন্যের দুঃখকে অনুভব করতে সক্ষম হবো। (ঈদুল ফিতরের খুতবা, ১৩ অক্টোবর ২০০৭ইং)

এছাড়া আমরা ঈদ শেষে দোয়া করি হুযূর (আই.) এর রীতি হলো জামাতের শহীদগণ, বন্দীগণ, জামাতে দায়িত্বরত ব্যক্তিবর্গ ওয়াকেফে যিন্দেগী, ওয়াকফে নও, চাঁদাদাতাগণ, যারা নানা সমস্যায় আছে তাদের জন্য ও ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য দোয়া করা হয়। আসুন, আমরা হুযূর (আই.) এর জন্য, সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য ও আমাদের দেশের জন্য দোয়া করি। আমীন, ঈদ মোবারক, সবাইকে ঈদ মোবারক।

(পুনর্মুদ্রিত, পাক্ষিক আহমদী, ১৫ জুলাই, ২০১৬)

সং বা দ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আখাউড়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আখাউড়া মজলিস আনসারুল্লাহ তবলীগি খাস কমিটির উদ্যোগে গত ২০শে মে ২০১৭ইং বাদ আছর আখাউড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নামাজ সেন্টারে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সিরাতুন নবী (সা.) জলসার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব জনাব সালেহ মুহাম্মদ ভূঞা, প্রেসিডেন্ট আখাউড়া, কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব বিল্লাল আহমেদ, সেক্রেটারী মাল, নযম পাঠ করেন জনাব হাফিজুর রশিদ (কাজল), জেনারেল সেক্রেটারী। বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে বক্তৃতা করেন, সিরাজ উদ্দিন নঈম খাদেম, যয়ীম মজলিস আনসারুল্লাহ, মৌলভী মো: আব্দুল হাকিম, মোয়াল্লেম, কোড্ডা, মৌলভী মোঃ আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম বিষ্ণুপুর, জনাব আমীর মাহমুদ ভূইয়া, যয়ীম বিষ্ণুপুর মজলিস আনসারুল্লাহ, মাওলানা তাহের আহমদ, মোয়াল্লেম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মোঃ মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট, শরীফ আহাম্মদ ভূঞা, সেক্রেটারী তবলীগ, কোড্ডা। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদেরকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। সীরাতুন নবী জলসায় লাজনা সদস্য ৯জন, আনসার ২০জন, খোদ্দাম ৩ জনসহ সর্বমোট ৩২জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব হাফিজুর রশিদ (কাজল)।

সালেহ মুহাম্মদ ভূঞা

খুলনার ১১তম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১৭ অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার মুসী ও মুসীয়াদের অংশগ্রহণে গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিট হতে বিকাল ২টা পর্যন্ত ১১তম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১৭ দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জনাব এস.এম.আনসার উদ্দীন আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ থেকে আগত জনাব রাশেদ আহমেদ খাদেম ও রাফি আহমেদ পলাশ, সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে এই সম্মেলন শুরু করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাম মোহাম্মদ ওমর আলী এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। অতঃপর নযম পরিবেশন করেন জনাব এন.এ.শাহীন আহমেদ।

উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি জনাব এস.এম.আনসার উদ্দীন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা। উদ্বোধনী ভাষণের পর খুলনা জামাতে ওসীয়্যত বিভাগের এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর রিপোর্ট পেশ করেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, সেক্রেটারী ওসীয়্যত। এরপর মুসী ও মুসীয়াদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মাওলানা রইস আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ।

আল ওসীয়্যত পুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন শর্ত ও বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত বিধি বিধানের আলোকে উপস্থিত মুসী ও মুসীয়ানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। এই সম্মেলন সকাল ৯-৩০ মিনিট হতে দুপুর ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে খুলনা জামাতের বর্তমান ৪২ জন ওসীয়্যতকারীর মধ্যে ২৩ জন ওসীয়্যতকারীসহ সর্বমোট ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস.এম. আনসার উদ্দীন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাত ও হালকায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত

ঢাকার মাদারটেক হালকা

গত ৭ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে মাদারটেক হালকার মসজিদুল হুদায় মহান মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মজনুর রহমান, নায়েব যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আকবর হোসেন। আরবি কাসিদা পরিবেশন করেন সর্বজনাব, তাহমীদ-উর-রশীদ (মহিম) ও শিহাব উদ্দিন মাস্তান (রুম্মন)। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের পটভূমি, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয় বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খ্রিষ্টান ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মোহাম্মদ কুদরতে রহমান ভুঁইয়া, প্রেসিডেন্ট মাদারটেক হালকা। এরপর সভাপতির সমাপণি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। সভাতে মাদারটেক হালকার সদস্য ও জেরে তবলীগসহ প্রায় ১৪৫ জনেরও বেশি উপস্থিত ছিলেন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

গাজীপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুরের উদ্যোগে গত ২৪/০৩/২০১৭ তারিখে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবস স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বি.জে.চৌধুরী সাহেব, নযম পাঠ করেন বেলাল আহমদ। এরপর বক্তৃতাপর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী এবং তাঁর দাবীর সত্যতা বিষয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে তুলে ধরেন পর্যায়ক্রমে জনাব কবির আহমদ, জনাব মোহাম্মদ ইকরামুল হক, জনাব ইকবাল আহমদ, এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব কামরুল ইসলাম প্রধান। এরপর সভাপতি তার সমাপণি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রধান

কটিয়াদী

গত ২৪/০৩/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ কটিয়াদী মসজিদে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এম.এ.হান্নান প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. কটিয়াদী। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবী আব্দুল মান্নান এবং নযম পেশ করেন আব্দুল মান্নান। জনাব মোবাশ্বের আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, লাজনা ও আতফালসহ ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এম.এ.হান্নান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর

গত ৩০/০৩/২০১৭ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর-এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। প্রথমে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জেসমিন আক্তার। এরপর প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ দোয়া পরিচালনা করেন। অতঃপর রসূলে করীম (সা.)-এর প্রশংসায় মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা কাসীদাহ্ পাঠ করেন আমাতুল মজিদ সাহেবা। এরপর ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জন্ম ও বাল্যকাল, ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমনের সময় ও লক্ষণ, ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর দাবীর সন ও বংশ, বয়আত নেয়ার ঘোষণা ও উদ্দেশ্য, বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা ও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এবং ২৩ মার্চ পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন যথাক্রমে নিশাত তসলীম মুনা, আমাতুর মতিন, ফারহানা রিযোয়ান, জেসমিন আকতার, আমাতুল মজিদ ও মুশতারিন আকতার। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোট ১০ জন।

আমাতুল মজিদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের উদ্যোগে ২৬-৩০-২০১৭ তারিখে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন সুইট জাবের। দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট সাহেব। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর নামকরণের স্বার্থকতা, ২৩ মার্চ-এর গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন আনোয়ারা বেগম, দিলরুবা জামান, শাহানায পারভিন, গুলশান আরা, মনসুরা বেগম, আমাতুল করিম এবং নযম পেশ করেন সালহানা তওহিদ ও আমাতুল করিম।

সবশেষে একটি আরবী কাসিদা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা-নাসেরাতসহ মোট ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

দিলরুবা জামান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর-ঈশ্বরদী

গত ২৩ মার্চ ২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর, ইশ্বরদীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তিলাওয়াত, নযম পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করেন রেজোয়ানা জ্যোতি। নযম পাঠ করেন ফাল্গুনী সাহেবা। কুরআন হাদীসের আলোকে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মর্তজারা বেগম। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর সত্য মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হওয়ার প্রমাণ-এর ওপর বক্তব্য রাখেন শ্যামা। ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্য-এর ওপর বক্তব্য রাখেন আফছানায়ারা। পবিত্র কুরআন ও দোয়ার গুরুত্ব-এর ওপর বক্তব্য রাখেন পাপীয়া খাতুন। ব্যাক্তিত্বের উন্নয়নে মহানবী (সা.) এর আদর্শ-এর ওপর বক্তব্য রাখেন আসমা হাবীব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছু ঘটনা এর ওপর বক্তব্য রাখেন জ্যোতি। সন্তানদের তরবিয়ত বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর বক্তব্য রাখেন রওশয়ারা। সবশেষে সভানেত্রীর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

রওশনয়ারা

নাখালপাড়া

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে গত ০৭ এপ্রিল ২০১৭ শুক্রবার বাদ জুমুআ বাইতুল হাদী, নাখালপাড়া মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল হান্নান, নায়েব যয়ীম আলা, মজলিস আসারুল্লাহ্, ঢাকা। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও উর্দু নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব ফারুক আহমদ ও জনাব নাসির আহমদ। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুদ্দিন ভুঁইয়া সাহেব স্বাগত বক্তব্য রাখেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয় বিষয়ের ওপর অত্যন্ত সুন্দর ও ইতিহাস ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন স্থানীয় মৌলবি নাসের আহমদ আনসারী ও কেন্দ্র থেকে আগত মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান। তারপর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

শফিকুল হাকিম আহমদ

তেরগাতী

গত ২৩/০৩/২০১৭ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হতে ১০-২০ মিনিট পর্যন্ত তেরগাতী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্যোগে ২৩ মার্চ হযরত ইমাম মাহ্দী ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ আনোয়ার আলী, প্রেসিডেন্ট উক্ত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মাসরূর আহমদ উৎস, উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব রাকিউন আহমদ পাপেল। তারপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর আবির্ভাব, তাঁর (আ.)-এর সত্যতা দাবী ২৩ মার্চ হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে বয়াত ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় বক্তাগণ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তাগণ হলেন সর্বজনাব আনহার আহমদ পায়েল, জনাব নূরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মৌলানা নাবিদ আহমদ লিমন, সদর মুরব্বী তেরগাতী জামাত। এরপর বাংলায় নযম পরিবেশন করেন দুর্জয় আহমদ তুষার। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে ১০ জন মেহমানসহ মোট ৭২ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

নাটাই

গত ২৩/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাটাই-এর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মনতাজ উদ্দিন আহমদ, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাটাই। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব এস.এম.তাফহীম বেলাল। ১ম বক্তা ছিলেন জনাব মিনহাজ উদ্দিন আহমদ অলক, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সরাইল। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল, রসূল প্রেমে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)। ২য় বক্তা প্রাধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, মোয়াল্লেম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ। সবশেষে বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব সানাউল করিম বাবু। সবশেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ মোট ৬৬ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মনতাজ উদ্দিন আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্, তেবাড়িয়া

গত ২৮/০৩/২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবড়িয়ার উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন বুলবুলি আনিছ। নযম পাঠ করেন নাবিলা আহমদ, ২৩ মার্চ-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন বিনতে ইয়াছমিন। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন স্বপ্না মোস্তারী, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ সম্পর্কে বলেন নিলুফার ইয়াছমিন। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অমৃতবাণী সম্পর্কে বলেন আমাতুস শামীম। পরিশেষে ২৩ মার্চ কেন আহমদীরা পালন করে এ বিষয়ে সার্বিকভাবে আলোচনা করেন লাকী আহমদ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়া। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

লাকী আহমদ

বিভিন্ন জামাত ও হালকায় তালীম-তরবিয়তী মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আশকোনা

গত ০৩ এপ্রিল ২০১৭ইং রোজ সোমবার বাদ মাগরিব আশকোনা হালকার উদ্যোগে বায়তুল হুদা মসজিদে এক বিশেষ তালীম-তরবিয়তী মূলক আলোচনা সভা সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুল্লিাহ। উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহন করেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। সাথে আসন গ্রহন করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জনাব আব্দুস সুবহান সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত, জনাব তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব আমীর ও তবলীগ সেক্রেটারী ঢাকা জামাত, জনাব নাজির আহমেদ ভুইয়া, জনাব জুলফিকার হায়দার সাহেব সহ ঢাকা জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব বশীর উদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্থানীয় জামাতের হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব তোফাজ্জল হোসেন ও স্থানীয় মোয়াল্লেম এনামুল হক রনি উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ সভাটি সঞ্চালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব ফারুক আহমদ।

সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আউসাফ আহমদ রাফা, নযম পাঠ করেন জনাব জিকরে এলাহী। এরপর পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় পুরুষদের পরিচয় নেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব আর লাজনাদের দিকে সদর লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশ মোহতারিমা রওশান জাহান সাহেবা। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভাবে এক এক করে পরিচয় নেয়া হয়। এ সময় মওলানা সাহেব বলেন, আমরা আহমদীরা ভাই ভাই তাই প্রত্যেকের পরিচয় জানা দরকার। পরিচয় পর্ব শেষ করে মূল তরবিয়তী আলোচনা শুরু হয়। পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক জোরদার করার জন্য যোগাযোগ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। বিবাহ-শাদী সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুরবানী করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেন। কোন ছেলে মেয়ে যেন আহমদীদের বাইরে বিয়ে না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেন। নতুন প্রজন্মদের আহমদীয়াত ধরে রাখার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা যোগাযোগ ও দোয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। শেষের দিকে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান ও আলোচনা অত্যন্ত নীরবে শ্রোতাগণ উপভোগ করেন। সভার শেষে সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। উক্ত সভায় ৪ জন জেরে তবলীগ মেহমান, ৯ জন নও-মোবাঈনসহ পুরুষ ৮৫ জন ও লাজনা ৬২ জন সর্বমোট ১৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা ও আলোচনায় সকলেই সন্তুষ্ট হন ও মুলাকাত করেন।

মিরাজ উদ্দিন আহমদ

ইয়ারাংছড়ি হালকা

গত ১৪/০৪/২০১৭ইং খাকসার এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম জিকরে এলাহীসহ ইয়ারাংছড়ি হালকা সফরে যাই। সেখানে সকল আহমদী সদস্যদেরকে নিয়ে জুমুআর নামাজ আদায় করি। এবং বাদ মাগরিব সকল সদস্যদেরকে নিয়ে একটি তরবিয়তী সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠোনে একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে এবং স্থানীয়দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মোয়াল্লেম জিকরে এলাহী। একজন আহমদী হিসেবে নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে খাকসার বক্তব্য প্রদান করি। উক্ত অনুষ্ঠান রাত ১১টা পর্যন্ত চলে। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান শেষে একজন জেরে তবলীগ বয়আত করেন এবং একজন বয়আত নবায়ন করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

মোহাম্মদ শওকত হোসেন

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্যোগে গত ২৮ এপ্রিল শুক্রবার ১ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত। ইজতেমায় ১ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জেলা নায়েম আল আমিন ভূঁইয়া। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সকালে শুরু হয়। এতে নযম পরিবেশন করেন আলী মিয়া, বক্তব্য প্রদান করেন মৌলবী আবদুস সালাম। পরে সভাপতির বক্তৃতার মধ্য দিয়ে ১ম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। আরম্ভ হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। ইজতেমায় বিরতি দেয়া হয় গোসল ও খাবারের। বাদ জুমুআ সমাপনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। সমাপনী অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন কামরুজ্জামান ভূঁইয়া, নযম পরিবেশন আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া, যয়ীম। এরপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। এখানে বক্তৃতা করেন মোয়াল্লেম আবদুস সালাম এবং প্রেসিডেন্ট শফিকুল আলম। সভাপতির ভাষণের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

যয়ীম- আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া।

উথলী

চুয়াডাঙ্গা জেলার আওতাধীন মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, উথলী, সন্তোষপুর, শৈলমারী, চুয়াডাঙ্গা ও বটিয়াপাড়া মজলিসের যৌথ উদ্যোগে নির্ধারিত তারিখ ২৭ ও ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার ১৭তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। ১ম অধিবেশন শুরু হয় ২৭ এপ্রিল এপ্রিল বাদ মাগরিব বৃহস্পতিবার। এ মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ হালিম আহমদ হাজারী সাহেব। তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন জনাব মোহাম্মদ ফজলে এলাহী সাহেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত, নযম ও দোয়া করা হয়। তারপর সভাপতি সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ হয়। তারপর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথলীর প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দীন রিপন স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এবং একইসাথে আনসারদের দায়িত্ব ও আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত তার ওপর তিনি তার বক্তব্যে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। রাত ১০ টায় ১ম অধিবেশন শেষ হয়। তারপর মেহমানদের রাতে খাবার পরিবেশন করা হয়। রাতে মসজিদে তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা রাখা হয়। তাহাজ্জুদের পরে সকালে ফজরের নামায আদায় করা হয়। নামায শেষে হালকা চা-চক্রের ব্যবস্থা রাখা হয়। পরবর্তিতে সকালের নাস্তা খাওয়া হয়। ২য় অধিবেশন শুরু হয় ২৮ এপ্রিল শুক্রবার সকালে। সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত প্রতিযোগিতা হয়। বিষয়বস্তু ছিল কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, পয়গামে রেসানী, কুইজ, চেয়ারে স্থান দখল ইত্যাদি। তারপর ২ ঘন্টা বিরতী দেওয়া হয়। বেলা ১১টা হতে ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত সমাপ্তি অধিবেশন হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে কুরআন ও নযম প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী সর্বপ্রথমে কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন। আনসারদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক ও জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, সাহেব জেলা নায়েম আলা। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মেহমানদের যাতে কোন প্রকার ত্রুটি না হয় সেদিকে সর্বক্ষণ নজর রাখেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করেন মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম শুভ, মুরব্বী সিলসিলাহ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ, আহাদনামা পাঠ, বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এখানে উপস্থিত ছিলেন সর্বমোট ৪৫ জন।

মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহীন

ফাজিলপুর

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী কেন্দ্রের অনুমোদনক্রমে, ফাজিলপুর ও কুঠিরহাট মিলে গত ২৮/০৪/২০১৭ তারিখ ১মবার ফাজিলপুর জামাতে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশনে প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা হয়। প্রতিযোগিতার বিচারকগণ হলেন, জনাব হাসান আহমদ, জেলা প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম। জনাব মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খান, স্থানীয় যয়ীম। জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল, পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত, অর্থসহ নামায শিক্ষা, নযম, বক্তৃতা এবং কুইজ। প্রত্যেক প্রতিযোগিতার ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২য় অধিবেশনের সভাপতি জনাব হাসান আহমদ। শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আবুল খায়ের। নযম পাঠ করেন জনাব ফখরুল আলম। তারপর আনসারদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আবুল খায়ের, জনাব মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খান, সর্বজনাব, হাসান আহমদ। পরিশেষে দোয়া ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

মাতা-পিতা দিবস উদযাপন

আশকোনা মজলিসে গত ২১/০৪/২০১৭ ইং তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মাতা-পিতা দিবস পালিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মজলিসের কায়েদ জনাব মিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ (বাবু)। শুরুতেই কুরআন পাঠ করেন আতাউল সরকার। অতঃপর সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব ও বক্তব্য এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব তোফাজ্জল হোসেন সাহেব এবং একাধিক মাতা-পিতা ও সন্তানেরা তাদের নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সবশেষে মৌলবী এনামুল হক রনি সাহেব মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ (বাবু)

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার প্রথম কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ এপ্রিল রোজ বুধবার বাদ মাগরিব অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোশারফ হোসেন রিজিওনাল নাযেম ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেট রিজিওন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা নাযেম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জনাব আলামীন সাহেব, মুছা মিয়া সাহেব, প্রেসিডেন্ট ঘাটুরা, শামসুদ্দিন মাসুম মুরব্বী সিলসিলাহ।

এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন এস.এম.ইব্রাহীম। পরিচিতি পর্ব: তারপর দপ্তর ভিত্তিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন রিজিওনাল ও জেলা নাযেম সাহেব। তারপর প্রশ্নোত্তর পর্ব সভাপতি সাহেব। তালিম ও তরবিয়ত, তবলিগ বিষয়, চাঁদা আদায়, নামায পড়া। মজলিসের রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

মোহাম্মদ দুলাল মিয়া

বীরগঞ্জে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ০৩/০৫/২০১৭ তারিখ রোজ বুধবার বাদ মাগরিব হতে ০৭/০৫/২০১৭ তারিখ রোজ রবিবার পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তীমূলক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে জামাতের আতফাল ও নাসেরাত অংশ গ্রহণ করে। এসব দিনগুলোতে কুরআন শিক্ষা, নযম শিক্ষা, দ্বীনি মালুমাত অংশ, নামায শিক্ষা, বিভিন্ন দোয়া, আহমদীদের সম্পর্কে বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নগুলো শিখানো হয়। এছাড়াও বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ঈমানবর্ধক ঘটনা ও শিক্ষামূলক গল্প শুনানো হয়। এসব কিছু নিগরানী করেন জনাব কামাল উদ্দীন প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বীরগঞ্জ। আর তার সাথে সহযোগিতা করেন মোহাম্মদ রুহুল আমীন রিওন, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

কামাল উদ্দীন, প্রেসিডেন্ট

বিশেষ ঘোষণা

ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যম যেমন ওয়েবসাইটসহ টুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব প্রভৃতিতে **"রাবওয়া টাইমস"** নামে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটি সচল রয়েছে সেটির বিষয়ে হুযূর (আই.)-এর সাম্প্রতিক দিক-নির্দেশনা হলো-

"রাবওয়া টাইমস আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কোন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নয়। রাবওয়া শব্দটি যদিও জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখে তবুও শুধুমাত্র এ শব্দটি দেখেই জামাত সম্পর্কে ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি করা উচিত নয়। এ ওয়েবসাইটের প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিগত ভাবে এটি চালাচ্ছে যেখানে তারা তাদের নিত্য-নতুন চিন্তাধারা এবং প্রস্তাবনা উল্লেখ করছে। আহমদী যুবক, বালক এবং মেয়েদের বিশেষ ভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং এ ওয়েবসাইটের দ্বারা কোন প্রকার প্রভাবিতও হওয়া ঠিক নয়। আর এ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত জামাত সম্পর্কীয় কোন ধরণের ভাবমূর্তি অবলম্বন করা উচিত নয়।"

হুযূর (আই.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি জামাতে এবং প্রত্যেক অঙ্গ-সংগঠনগুলোতে এটি ঘোষণা করা হলো।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চড়াইখোলার সেক্রেটারী তবলীগ জনাব হানিফ উদ্দিন সাহেব গত ১৮/০৪/২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সৈয়দপুর হাসপাতালে ভোর ৩.৩০ মি.-এর দিকে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চড়াইখোলাতে মুখালেফাতের সময় অনেক দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। সবসময় জামাতের সাথে ছিলেন। জামাতের জন্য মার খেয়েছেন। জামাতের একজন আদর্শ একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তার মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত। তার রূহের মাগফেরাতের জন্য সবার নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ ইমরান আহমদ

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি

সুস্থ থাকার সহজ উপায়

রোযার মাসে সুস্থ থাকার জন্য খুব বেশি তৎপরতার প্রয়োজন নেই। সাধারণ কিছু বিষয় খেয়াল রাখলেই শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা যায়।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের 'খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান' বিভাগের প্রধান ফারাহ মাসুদা বলেন, "রমযানে কেবল মাত্র খাবারের বিষয়েই সচেতন থাকলে হয় না, পাশাপাশি শরীরের প্রতি যত্নবান ও যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে হয়।"

তিনি আরও বলেন, "রমযান মাসে ভালো ডায়েট চার্টের পাশাপাশি বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। আর মানতে হবে কিছু নিয়ম।"

* রোযা রেখে কোনোভাবেই অধিক শারীরিক পরিশ্রম করা যাবে না।

* যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, তাদেরকে এই সময়ে তা বাদ দিতে হবে। এর পরিবর্তে হালকা যোগ ব্যায়াম করা ভালো।

* ইফতারের পর থেকে প্রচুর পানি ও ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

* যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে হবে। তাই বলে শুয়েবসে দিন কাটানো যাবে না। হালকা চলাফেরা ও ঘরের কাজ নিজ থেকেই করা উচিত। তা না হলে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

* ইফতারের সময় তাড়াহুড়া করে বেশি খাওয়া যাবে না।

* সম্ভব হলে ইফতারের পরে কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটাহাঁটির অভ্যাস গড়ে তোলা।

* সেহেরি ও ইফতারে সুষম খাবার খাওয়া।

* রোযা রেখে যারা কেনাকাটা করতে যাবেন তাদের বিশেষভাবে নিজের শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। একদিনে অনেক ঘুরে কেনাকাটা না করে সম্ভব হলে দু'তিন দিনে কেনাকাটা করা ভালো। এতে শরীরের উপর চাপ কম পড়বে।

* রোযার মাসে অনেকেরেই ঘুমে সমস্যা হয়ে থাকে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। এক্ষেত্রে প্রচুর পানি পান, হালকা ব্যায়াম ও তেলমুক্ত খাবার সবচেয়ে ভালো পথ্য।

* সুস্থ থাকার আরেকটি সহজ উপায় হল হাসিখুশি থাকা। এতে মন ভালো থাকে ফলে শরীরও ভালো থাকে। পরনিন্দা, পরচর্চা থেকে দূরে থাকলে মানুষের মন ও শরীর দুটোই ভালো থাকে।

সুস্থ থাকার আরেকটি সহজ উপায় হল হাসিখুশি থাকা। এতে মন ভালো থাকে ফলে শরীরও ভালো থাকে। পরনিন্দা, পরচর্চা থেকে দূরে থাকলে মানুষের মন ও শরীর দুটোই ভালো থাকে।

* সুস্থ্যতার জন্য ধূমপান করা থেকে বিরত থাকাটা খুব প্রয়োজন।

এছাড়াও নিজের ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, অন্যের প্রতি কোনো রকম রাগ পোষণ না করে। মোটকথা আত্মসংযমের মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক দুভাবেই সুস্থ থাকা যায়।

(সূত্র: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)

অতিরিক্ত লবণ খেলে হতে পারে ভয়ঙ্কর ২টি রোগ

অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ খেয়ে সারা পৃথিবীতে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন বহু মানুষ। নতুন এক গবেষণার রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রত্যেক বছর ১৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যান শরীরে অতিরিক্ত সোডিয়াম জমা হওয়ায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী দিনে ২ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া উচিৎ নয়। গবেষকরা ১৮৭টি দেশের সাধারণ মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন বহু ক্ষেত্রেই দিনে এর থেকে বেশি পরিমাণ লবণ খেয়ে থাকেন তারা।

অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ উচ্চ-রক্তচাপের অন্যতম কারণ। উচ্চ-রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা।

গবেষক সারা পৃথিবী জুড়ে ২০৫টি সমীক্ষা করে দেখেছেন একজন মানুষ গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩.৯৫ গ্রাম লবণ খেয়ে থাকেন। অর্থাৎ যা নির্ধারিত পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ।

মধ্য এশিয়ায় লবণ খাওয়ার প্রবণতা সবথেকে বেশি। এই অঞ্চলের কোনও ব্যক্তি দিনে গড়ে প্রায় ৫.৫১ গ্রাম লবণ খেয়ে থাকেন।

(তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট)

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হুযূর(আই.)-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

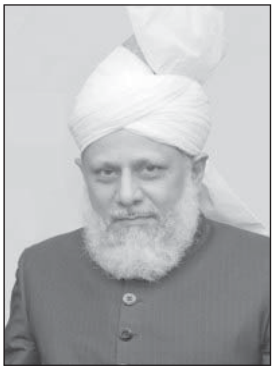

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)

১। আমরা কি বয়াতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামাতের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছরটি আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লিল চিন্তাধারার উদ্রেক করে– আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমনসব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হলে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী(সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পর-নিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী(সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন।]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরে অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? (কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী(সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্যলাভের উত্তম পন্থা এবং এর অভ্যাস মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে এটি রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরুদ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপন-পর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়– আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়– আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসূলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে– সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহকে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ(সা.)-এর নির্দেশাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হল সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছরটিতে আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মসেবায় এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলি সর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধন-সম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মান-সম্ভ্রমের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

প্রকাশনায়: আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

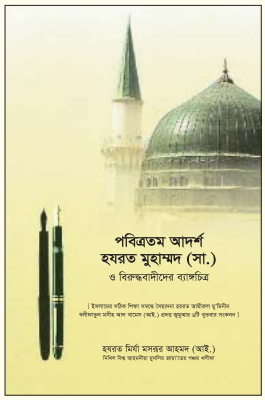

আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ রীতি অনুযায়ী আলো এবং সত্য সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে থাকে। যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক লোক, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলদের বিরোধীতা করে ঠিকই কিন্তু পরিণতিতে খোদার ক্রোধভাজন হয়। একইভাবে, আজও কতক মানুষ এমন রয়েছে, যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধীতায় মত্ত আছে। আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ী তাদের পরিণতিও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনই কতক মানুষ বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ২০০৬ সালে তাদের পত্র-পত্রিকায় মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র মূলক কিছু কার্টুন আঁকে।

২০০৬ সালের ঐ ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মীর্যা মসরূর আহমদ (আই.) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শান তথা মর্যাদার উপর একাধারে ৫টি খুতবা প্রদান করেন। উক্ত খুতবাগুলি তিনি ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০, ১৭, ২৪ এবং মার্চ মাসের ০৩ ও ১০ তারিখে প্রদান করা হয়। খুতবার এ বইটিকে সমৃদ্ধ করার মানসে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর আরো ১টি খুতবা সংযোজন করা হলো।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে উক্ত বইটি সংগ্রহ করে তা পাঠ করার জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি আকুল আহ্বান জানাচ্ছি।

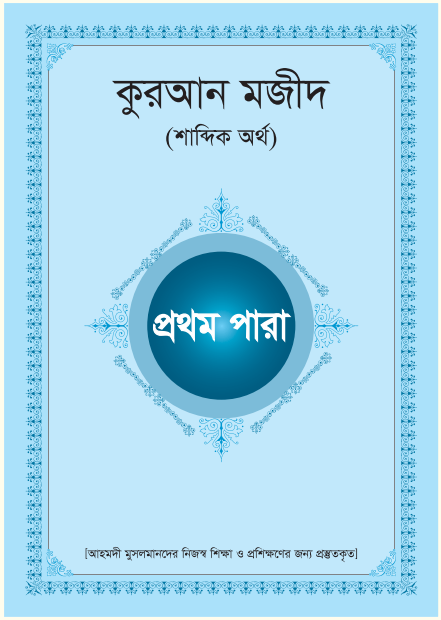

বর্তমান যুগে আমাদের নিকট পবিত্র কুরআন কেবল বাহ্যিকভাবে মূল্যবান বলে পরিগণিত হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই কুরআনের ভিতরে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা আহরণের চেষ্টাই করে না। এ কারণে কুরআন মজীদের অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝার স্বার্থে এই প্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অনুবাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হল। আশা করি জামা'তের সকলেই এ থেকে উপকৃত হবেন।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে এটি সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নি যেন এটি অধ্যয়ন করেন, সে আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক **"আহমদী"** পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে বিনীতভাবে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী জুলাই ২০১৭ থেকে আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা ৭৫০ টাকা অর্থাৎ ৩ বছরের অধিক বকেয়া রয়েছে তাদের পত্রিকা আর সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। অতএব নিজ-নিজ গ্রাহক চাঁদা অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান জানানো হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯, ০১৭৯৮-০৪০৪৫৮,
০১৭১৭-৯৯৭৩০৬

বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ করুন

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

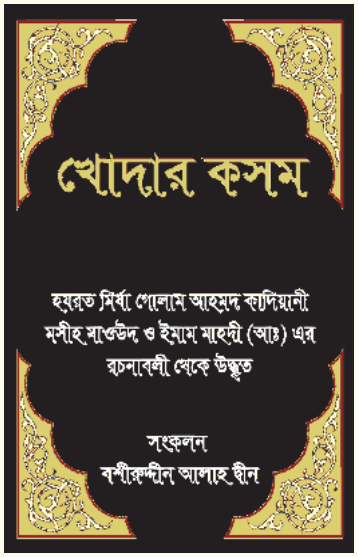

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃত একটি সংকলন 'খোদার কসম' নামক বইটিতে তিনি (আ.) খোদার নামে কসম খেয়ে তাঁর সত্যতার প্রমাণের জন্য যে কথা বলেছেন তা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটি পড়লে একজন পাঠক স্পষ্টতঃ এটি বুঝতে পারে যে, একজন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হলে কখনো এভাবে খোদার নামে কসম খেয়ে এমন প্রতাপান্বিত কথা বলতে পারে না। ভারতের প্রখ্যাত বশীরুদ্দীন আলাহ দ্বীন সাহেব এ বইটি সংকলন করেন। বর্তমানে বাংলা ভাষাতেও এটি পাওয়া যাচ্ছে। তবলীগের জন্য উপযোগী উক্ত বইটি সংগ্রহ করে তা পাঠ করার জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 79 | 23 & 24 Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

30th June, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে উল্লেখ করেন: "আমি সকল মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু ও আর্যদের নিকট এ কথা প্রকাশ করছি যে, এ দুনিয়ায় আমার কোন শত্রু নেই। আমি মানবজাতিকে এরূপ ভালোবাসি যেরূপে এক স্নেহময়ী মা তার শিশুকে ভালোবাসে, বরং তা হতেও বেশী। আমি কেবলমাত্র মিথ্যা মতবাদের শত্রু যা দ্বারা সত্যের বিনাশ ঘটে। মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমার কর্তব্য এবং মিথ্যা, শিরক, অত্যাচার এবং প্রত্যেক অসদাচরণ হতে অসন্তুষ্ট হওয়াই আমার ধর্ম।"

(রূহানী খাযায়েন, ১৭ খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com